অদ্য

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

পরলোক গমন করিলেন।

তাঁহারই পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশে

বাঙ্গলায় বিদেশী

উৎসর্গীকৃত হইল।

২রা আষাঢ়, ১৩৩২

বাঙলায় বিদেশী
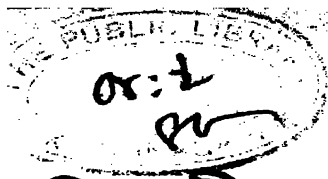
পরাধীনতার মধ্যে স্বাধীনতা

আমাদের বঙ্গমাতার দুইটী ছেলে—হিন্দু আর মুসলমান। আজ সাত শত বৎসর হইল এই দুইটী ভাই পাশাপাশি বাস করিতেছে। যখন প্রথমে এদেশে মুসলমানেরা আসিয়াছিলেন, তখন অবশ্য তাঁহারা বিদেশী ছিলেন। কিন্তু একই মায়ের স্তনধারা এতকাল ধরিয়া পান করিয়া হিন্দু-মুসলমান এখন ভ্রাতৃভাবের বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছেন। তাই আমাদের বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—

রণধারা বাহি, জয় গান গাহি
উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরি পর্ব্বত
যারা এসেছিল সবে,
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে
কেহ নহে নহে দূর
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তা'র বিচিত্র সুর।

সোণার বাংলা ছিল স্বাধীন। মুসলমানেরা একদিনে আসিয়া একটি যুদ্ধে হারাইয়া যে সে স্বাধীনতা হরণ করিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে। বাঙ্গালী পদে পদে তাহাকে বাধা দিয়াছে। বাঙ্গালী ভীরু নহে—তাহাকে সে অপবাদ যাহারা দেয়, তাহারা মিথ্যাবাদী। বাঙ্গলার বীর শশাঙ্ক ধর্ম্মপাল দেবপালের পরাক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষ একদিন সন্ত্রস্ত ছিল। বাঙ্গালীর এ বীরত্ব লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বে সহসা ভোজবিদ্যা বলে অন্তর্হিত হয় নাই। মুসলমান লেখকেরা যে লক্ষ্মণসেনকে কাপুরুষরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, তিনিই যৌবনে বঙ্গদেশ জয় করিয়া অদ্বিতীয় বীররূপে পূজিত হইতেন। লক্ষ্মণসেনের তবু পরাজয় হইল কেন ?

ইহার উত্তর এক কথায় দেওয়া সম্ভব নহে। মুসলমানগণ এক দুর্দ্দমণীয় শক্তি লইয়া জগতের সমক্ষে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রাণে মহম্মদ যে শক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইয়া দিকে দিকে বিজয়কেতন উড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহম্মদের শক্তিস্ফুলিঙ্গ একদিনে নির্ব্বাপিত হয় নাই। তাই অদম্য উৎসাহে মুসলমানগণ বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইলেন। সোণার বাঙ্গলার ঐশ্বর্য্যের কথা

তাঁহাদের কাণে অনেকদিন পূর্ব্বেই পৌঁছিয়াছিল। তাঁহাদের লোলুপ দৃষ্টি—বাঙ্গালার শস্য শ্যামল উর্ব্বর ক্ষেত্রের প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছিল। তাই প্রথম সুযোগেই তাঁহারা বাঙ্গালায় পদার্পণ করিলেন। তাঁহাদের অশ্ব চালনার কৌশল অতি অপূর্ব্ব। রণক্ষেত্রে এই অশ্ব পরিচালনার ফলেই তাঁহারা যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন। তাঁহাদের হৃদয় ভারতের অন্যান্য প্রদেশ জয় করিয়া গৌরবে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সেই গৌরবই তাঁহাদিগকে বাঙ্গালায় নবশক্তি প্রদান করিল। তাঁহাদের রণনীতির সমক্ষে লক্ষ্মণসেন সমানভাবে যুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

কিন্তু লক্ষ্মণসেনের পরাজয়েই যে সমগ্র বাঙলাদেশ জয় হইল তাহা নহে। মাত্র সামান্য একটী ভূখণ্ড মুসলমানের করায়ত্ত হইল। পূর্ব্ববঙ্গে তখনও মুসলমান একটুও স্থান পায় নাই। নদী বহুল পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান বিক্রম স্থাপন করিতে বহুদিন লাগিয়াছিল। বিষ্ণুপুরের রাজারা তিন শত বৎসর সমানভাবে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। আকবরের প্রাণপণে চেষ্টাতেই তাঁহাদের প্রথম পরাজয় হয়। এই রকম কত খণ্ড প্রদেশ যে স্বাধীন ছিল তাহা বলিয়া শেষ করা কঠিন।

মুসলমানেরা নগরে থাকিতে ভাল বাসিতেন। পল্লীবাসকে তাঁহারা নির্ব্বাসন অপেক্ষাও কঠোরদণ্ড মনে করিতেন। এই নগরের উপরই তাঁহাদের আধিপত্য পূর্ণ মাত্রায় থাকিত। কিন্তু পল্লী উপনগরে তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ ছিল খুব অল্প। পল্লীগুলি তখন আজ কালকার মতন হতশ্রী হয় নাই। ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর প্রকোপ তখনও বাঙ্গলায় প্রাদুর্ভূত হয় নাই। বাঙ্গালী তখন পল্লীতেই থাকিত। আর পল্লীগুলি নামে না হইলে কাজে একরূপ স্বাধীনই ছিল। তাহাদের অধিবাসীরা এক ছটাক জমী লইয়া বিবাদ করিয়া পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে যাইয়া তাহার বিচার প্রার্থনা করিত না। গ্রামের পঞ্চায়েতই এ সকল বিষয় ও পল্লীর স্বাস্থ্য সমাজ ও শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিত। কাজেই বাঙ্গলা দেশ নামে পরাধীন হইলেও, কার্য্যে ও ব্যবহারে স্বাধীনতা হারায় নাই।

তাহার পর কিছু দূর অন্তর অন্তরই ছোট বড় জমীদার থাকিতেন। তাঁহারা এখানকার জমীদারের মতন নখ দন্ত বিহীন ছিলেন না। তাঁহাদের সকলেরই দুর্গ ছিল। এই দুর্গের চারিদিকে পরিখা থাকিত। শত্রু আসিয়া সহসা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিত না। রাঢ়ের যে কোন স্থানে তোমরা যদি

দশ বিশ ক্রোশ হাঁটিয়া যাও, তবে এমন অনেক দুর্গ পরিখার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইবে। জমীদারদের নিজের ফৌজ ছিল। লাঠি তখন বাঙ্গালীর প্রধান অস্ত্র। লাঠি খেলায় বাঙ্গালী এমন সিদ্ধহস্ত হইয়াছিল, যে লাঠি দিয়া গোলাগুলিকেও সে ঠেকাইতে পারিত। দেশের শস্য তখন বিদেশে চলিয়া যাইত না। দেশের লোকে তাহাই খাইয়া সবল সমর্থ ছিল। জমীদারগণ তাঁহাদের শক্তিধর প্রজাদের সাহায্যে অর্দ্ধ স্বাধীন ভাবে বাস করিতেন। মুসলমান সুলতানের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ কেবল কর প্রদানে। কর নিয়মমত পাঠাইলে কেহ আর তাঁহাদের কাজে হস্তক্ষেপ করিত না।

মুসলমানেরা যুদ্ধ করিতে পারিতেন, কিন্তু রাজ্য শাসনের অশেষবিধ কার্য্য করা তাঁহাদের ক্ষমতায় কুলাইত না। বিশেষতঃ হিসাবনিকাশের নামে তাঁহারা বড় ভয় পাইতেন। এ কাজটা বরাবর তাঁহারা হিন্দুকর্ম্মচারীদের দ্বারা করাইতেন। আর লেখাপড়ার অনেক কাজই করিয়া দিত হিন্দু। সুতরাং দেশের আভ্যন্তরীন শাসন-ভার মুসলমানেরা হিন্দুদের উপরই ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন। এদিক দিয়াও বাঙ্গালী পরাধীনতার মধ্যে অনেকখানি স্বাধীনতা উপভোগ করিত।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রাজা গণেশ ও দনুজমর্দ্দন-দেব সহসা স্বাধীন হইয়াছিলেন। কিন্তু সমগ্র দেশের অধিকাংশ ভাগ যখন মুসলমানের করায়ত্ত, যখন মুসলমান সৈন্যে দেশ ছাইয়া গিয়াছে, তখন এ রকমটা সম্ভব হইল কেমন করিয়া? ইহার উত্তর পাইতে হইলে উপরকার কথাগুলি বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। দেশের মনটা তখনও স্বাধীন ছিল—দেশের অনেক কাজে তখনও স্বাধীনতা ছিল। তাই গণেশ তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা-বলে দেশকে জাগাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরাধীনতার মাঝ খানে বাঙ্গালী সাত বৎসর কাল পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিল। রাজা গণেশ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের উজ্জ্বল নক্ষত্র।

মোগল যুগেও যে বাঙ্গলা একেবারে নিবীর্য্য হইয়া পড়ে নাই তাহার প্রমাণ সীতারাম রায়, চাঁদ রায়, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য। ইহাঁদের বীরত্বে বাঙ্গালীর প্রাণে ভাবের নূতন বন্যা বহিয়াছিল। বাঙ্গালী বুঝিয়াছিল যে সে একটা জাতি।

কিন্তু বাঙ্গলার সর্ব্বনাশ করিয়াছে বাঙ্গালীর গৃহবিবাদ। প্রতাপাদিত্যের মতন বীর হয়তো সমস্ত বাঙ্গলার অধীশ্বর হইতে পারিতেন! হয়তো তাহার বংশ আজও বাঙ্গলায়

স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিত। কিন্তু বাঙ্গালী ভবানন্দ মজুমদারই ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করিলেন। বাঙ্গলার আশাপ্রদীপ একটি ফুৎকারে নিবিয়া গেল।

বাঙ্গলার মুসলমানেরা প্রথম হইতেই এদেশে ঘর সংসার পাতিয়াছিলেন। এদেশের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইয়া অন্যদেশে বিলাসিতায় ব্যয় করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হইত না। বাঙ্গলার টাকা বাঙ্গলাতেই ব্যয় হইত। বাঙ্গালীই তাহার ফলভোগ করিত। এইরূপে বাঙ্গলা তুর্কী আফগানকে আপনার জনরূপে পাইয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া মুসলমানদের সহিত হিন্দুদের বিবাদ বাধিত না তাহা নহে। ভাইয়ে ভাইয়েও তো বিবাদ হয়। কিন্তু তাই বলিয়া ভাইয়ে ভাইয়ে কি চিরদিন পৃথক হইয়া থাকে।

বাঙ্গলার মুসলমানকে আজ আর বিদেশী বলিয়া দূরে রাখিলে চলিবে না। বাঙ্গলায় যাহারা হিন্দু ছিল, তাহাদেরই অনেকে আজ মুসলমান বলিয়া পরিচিত। সাত শত বৎসরের একত্র বসবাসের ফলে হিন্দুমুসলমান এক হইয়া গিয়াছে। আমাদের আচার ব্যবহার রীতি-নীতির মধ্যে পরস্পরের আদান প্রদান হইয়াছে। হিন্দু

আজ মুসলমানের দেবতাকে পূজা করিতেছে মুসলমান হিন্দুর দেবতাকে ভক্তি করিতেছে। হরিদাস যবন হইয়াও শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত ছিলেন। সৈয়দ মর্ত্তুজা মুসলমান হইয়া এমন ভক্তিতে গলিয়া বৈষ্ণব পদাবলী লিখিয়া গিয়াছেন, যে তাহা পড়িয়া আজও কত নরনারী অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকে।

আবার হিন্দুও সত্যপীরের পূজা করে। কত পীরের ফকিরের আস্তানায় যাইয়া মানত করে। রোগমুক্তি হইলে সিন্নি দেয়। হিন্দুমাঝিরা নদীতে ঝড় উঠিলে পাঁচ পীরের দোহাই দিতে থাকে। উত্তাল তরঙ্গে যখন তাহাদের ক্ষুদ্র তরণী খানি দোল খাইতে থাকে, তখন ঐ পাঁচ পীরের নামে সুন্দর বন্দনামূলক ছড়া গাহিয়া থাকে—সিন্নী মানত করে! বাঙ্গলার হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্ম মিশিয়া দরবেশ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা গৌর নিতাইকেও পূজা করে, আবার মহম্মদের ধর্ম্মও মানে।

এমনি করিয়া দুই জাতি এক হইতে চলিয়াছে। হিন্দু মুসলমান দুই ভাই এই কথাটী মনে রাখিয়া তোমরা "বাঙ্গালায় বিদেশী" বইখানি পড়িবে।

প্রথম অধ্যায়।

পাঠানদিগের বঙ্গদেশ জয়

১

পৃথ্বীরাজ তিরৌরীর যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। তাঁহাকে যিনি যুদ্ধে হারাইয়া দিয়া নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিলেন সেই মহম্মদ ঘোরীর ভোগে হিন্দুস্থান আসে নাই। তাঁহার ক্রীতদাস কুতুবুদ্দিন দিল্লীর সুলতান হইলেন এবং যুদ্ধ করিয়া সমগ্র হিন্দুস্থান অধিকার করিবার কথা ভাবিতে লাগিলেন।

যে মুসলমান বীর বাঙ্গলা দেশ জয় করেন তাঁহার নাম মহম্মদবিন বখ্‌তিয়ার খিলিজী। তাঁহার বাড়ী আফগানিস্থানের অন্তর্গত ঘোর দেশে। চেহারা তাঁহার অত্যন্ত কদাকার ছিল; তিনি যখন সোজা হইয়া দাঁড়াইতেন, তখন তাঁহার হাতদুটি হাঁটু ছাড়াইয়া

যাইত। এই চেহারা লইয়া যেখানেই তিনি সৈনিকের চাকুরীর জন্ম যাইতেন, সেখানেই লোকেরা তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করিত। হতাশ হইয়া দিল্লীতে কুতবুদ্দিনের সৈন্যদলে চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করিলেন, কিন্তু সেখানেও তাঁহার চেহারা দেখিয়া কেহই তাহাকে চাকুরী দিল না। অবশেষে তিনি উঘলবেগ নামক একজন মুসলমান শাসনকর্ত্তার অধীনে ঘোড়সোয়ারের পদ পাইয়া সাহস এবং যুদ্ধের নিপুণতা দেখাইয়া খ্যাতি উপার্জ্জন করিয়া কুতুবুদ্দিনের অধীনে সৈন্যবিভাগে চাকুরী পাইলেন এবং ক্রমে ক্রমে নিজের অপরিমিত বিক্রম এবং বুদ্ধির বলে সেনাপতি পদে উন্নীত হইলেন। কুতুবুদ্দিন বিহার জয় করিবার জন্য ইঁহাকে পাঠাইলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বিহারের রাজধানী দখল করিয়া সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করিয়া অজস্র ধনসম্পদ লইয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়া তাহা মনিবের নিকট উপহার দিলেন। এই উপহার পাইয়া ত কুতুবুদ্দিন মহা খুসি, কিছু পরেই স্থুলতান তাঁহাকে বিহারের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন।

তখন লক্ষ্মণ সেন ছিলেন বাঙ্গলার রাজা। নবদ্বীপ ছিল তাঁহার রাজধানী। তাঁহার স্থশাসনে বাঙ্গালীরা খুব সুখে শান্তিতে বাস করিতেছিল। রাজসভার জ্যোতিষীরা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তুর্কীরা বাঙ্গলাদেশ অধিকার করিবে, সেইজন্য তিনি নবদ্বীপে রাজধানী তুলিয়া আনেন; ভাবিয়াছিলেন যে তুর্কীরা হয়ত এতদূরে

লক্ষ্মণসেন খিড়কির দরজা দিয়া পলাইলেন

পৃঃ ১৯—বাঙ্গলায় বিদেশী

আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবেনা, কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? বখ্‌তিয়ার খিলিজি যখন বাঙ্গলা আক্রমণ করেন তখন লক্ষ্মণ সেনের বয়স ছিল প্রায় ৯০ বৎসর, রাজসভাসদেরা তাঁহাকে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াছিল, কিন্তু তিনি যখন তাহাদের কথা শুনিলেন না, তখন অনেকেই তাহাদের ধন-সম্পত্তি লইয়া রাজধানী ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।

১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার খিলিজি সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া নিঃশব্দে বাঙ্গলার রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজধানীর কাছে আসিয়া তিনি তাঁহার সৈন্যদিগকে একটি বনে লুকাইয়া রাখিয়া ১৭টি ঘোড়সওয়ার লইয়া নবদ্বীপ সহরে প্রবেশ করিলেন, প্রহরীদিগকে বলিলেন তিনি রাজার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। রাজপ্রাসাদের নিকট আসিয়া তিনি এবং তাঁহার দলের লোকেরা প্রহরীদিগকে প্রবল বেগে আক্রমণ করিলেন—প্রহরীরা সে আক্রমণ রোধ করিতে পারিল না।

লক্ষ্মণ সেন তখন খাইতে বসিয়াছিলেন, বাহিরের গোলমাল শুনিয়া তিনি বুঝিলেন যে গণৎকারের গণনা ফলিতে বসিয়াছে, তিনি সেইজন্য যুদ্ধের কোন আয়োজন না করিয়া খিড়কির দরজা দিয়া তাড়াতাড়ি ছোট নৌকা করিয়া রাজধানী ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন। তিনি পলাইয়া যে কোথায় গেলেন তাহা লইয়া অনেকের মতভেদ আছে।

বখ্‌তিয়ার খিলিজির সৈন্যদল ইতিমধ্যে নবদ্বীপ আসিয়া পৌঁছিল —এবং অনেক হিন্দু মারিয়া রাজপ্রাসাদ দখল করিল। নবদ্বীপ লুণ্ঠন করিয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি গৌড়ে আসিয়া এই পুরাতন নগরটিকে বাঙ্গলার রাজধানী করিলেন। বাঙ্গলা বিজয়ের পর মহম্মদ অনায়াসেই নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই, দিল্লীর সুলতানের অধীন থাকিয়া বাঙ্গলার শাসনকার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

বাঙ্গলা জয়ের পরে মহম্মদের সখ হইল যে তিনি তিব্বত জয় করিবেন। হিমালয় দ্বারা সুরক্ষিত এই দেশটি জয় করিবার কথা শুধু পাগলেই ভাবিতে পারে, বাঙ্গলা জয়ের পরে মহম্মদের ধারণা হইয়াছিল যে তিনি অসম্ভব সাধন করিতে পারেন।

তিব্বতে যাইতে হইলে ব্রহ্মপুত্র নদী পার হইতে হয়, দুর্গম গিরিগুহা পার্ব্বত্যনদী অতিক্রম করিয়া যখন মহম্মদ তিব্বতে পহুছিলেন, তখন সে দেশের লোকেরা আনন্দের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা না করিয়া সাজসজ্জা করিয়া তাঁহার সৈন্যদের বাধা দিতে উপক্রম করিল। তিব্বতী সৈন্যদিগের যুদ্ধবেশ অদ্ভুত রকমের, তাঁহারা বাঁশের কঞ্চি সিল্কের সুতা দিয়া বাঁধিয়া বর্ম্ম তৈয়ারি করিত, তাহাদের মাথার শিরস্ত্রাণও বাঁশের ছিল, ধনুর্ব্বাণ ব্যবহার করিতে তখনকার দিনে তাঁহাদের মতন নিপুণ কেহই ছিল না।

তিব্বতী সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধে হারিয়া মহম্মদ তাঁহার শিবিরে

ফিরিলেন, সেখান হইতে খবর পাইলেন যে পনেরো মাইল দূরে কুরুমপুত্তন বলিয়া একটি প্রাচীর বেষ্টিত সহর আছে। সেখানকার ক্রিশ্চিয়ান রাজার অধীনে অসংখ্য তাতার যোদ্ধা ছিল, এবং সে দেশে প্রায় হাজারের উপর ঘোড়া রোজ বিক্রয় হইত। পরদিন সকালবেলায় সেইখান হইতে একটি প্রবল সৈন্যদল মুসলমান সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে রওনা হইবে, এই খবর মহম্মদের নিকটে পৌঁছিল।

তখনই একটি মন্ত্রণা সভা বসিল এবং সেখানে স্থির হইল যে মুসলমান সৈন্যরা তাহাদের শিবির গুটাইয়া বাঙ্গলা দেশে চুপি চুপি ফিরিয়া যাইবে। সম্মুখে তাতার সৈন্য পিছনে কামরূপ রাজার সৈন্য মহম্মদের প্রত্যাবর্ত্তনে বাধা দিতে লাগিল। অশেষ কষ্ট এবং লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া মহম্মদ দিনাজপুরের অন্তর্গত দেবকোটে পৌঁছিলেন, আলিমর্দ্দন খিলিজি বলিয়া মহম্মদের একজন বন্ধু সেখানে তাঁহাকে গোপনে হত্যা করেন। মহম্মদের মৃত্যুর পর আলিমর্দ্দন দিল্লীতে যাইয়া কুতুবুদ্দিনের নিকট হইতে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার ভার পাইয়া বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলেন। এখানে আসিয়া তিনি সুলতান আলাউদ্দিন নাম লইয়া স্বাধীন সুলতান বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করিলেন। এতবড় উপাধি ধারণ করিবার পর তাঁহার মাথা খারাপ হইয়া গেল, তিনি মনে করিলেন যে দুনিয়ার সমস্ত দেশের মালিক তিনি। তাঁহার অত্যাচারে অস্থির হইয়া

সভাসদগণ তাহার রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে তাঁহাকে হত্যা করিলেন।

সুলতান ঘিয়াসুদ্দিন।

তাহার মৃত্যুর পর গঙ্গোত্রীর শাসনকর্ত্তা হাসান আব্দীন, ঘিয়াসুদ্দিন নাম লইয়া বাঙ্গলার সুলতান হইলেন। হিন্দু মুসলমানে তিনি কোন প্রভেদ দেখিতেন না, তাহার আমলে সকলেই সুখে ছিল।

সুলতান আল্‌তামস বাঙ্গলাদেশে তাহার প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য দিল্লী হইতে যাত্রা করেন। প্রথমেই তিনি বিহার অধিকার করেন। কিন্তু ঘিয়াসুদ্দিনের সঙ্গে তাহার কোন যুদ্ধ হয় নাই, তাহাদের উভয়ের কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া সুলতানের সহিত বাঙ্গলার সুলতান ঘিয়াসুদ্দিনের একটা বোঝাপাড়া করাইয়া দিলেন। বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা দিল্লীর সম্রাটের নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করাতে সুলতান আলতামস দিল্লীতে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু আলতামস দিল্লীতে ফিরিবা মাত্র ঘিয়াসুদ্দিন যে কড়ারে সন্ধি করিয়াছিলেন তাহা মানিয়া চলিতে অস্বীকার করিলেন। ইহাতে আল্‌তামস ভীষণ চটিয়া গেলেন, তিনি তখনই তাহার ছেলে নাসিরুদ্দিনকে এই বিদ্রোহীকে শাসন করিবার জন্য বাঙ্গলা দেশে পাঠাইয়া দিলেন। গৌড়ের নিকটে একটি যুদ্ধে সুলতান ঘিয়াসুদ্দিনের মত্যু হইল। ঘিয়াসুদ্দিনের মৃত্যুর পর নাসিরুদ্দিন বাঙ্গলা ও বিহারের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইলেন।

সুলতান নাসিরুদ্দিন।

ঘিয়াসুদ্দিন বলবন্ যখন দিল্লীর মসনদে সুলতান তখন তাহার পুত্র নাসিরুদ্দিন বাঙ্গলা দেশের শাসনকর্ত্তার পদে আসীন। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে ঘিয়াসুদ্দিনের জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদের মৃত্যু হয়, সেই শোকে বৃদ্ধ সুলতান শয্যা লইলেন। বাঙ্গলাদেশ হইতে তিনি নাসিরুদ্দিনকে খবর পাঠাইয়া দিল্লীতে আনাইলেন, কিন্তু দিল্লীতে তাহার মন টিকিল না, কয়েকমাস পরে যখন ঘিয়াসুদ্দিন বলবনের শরীর খানিকটা ভাল হইল, তখন তিনি একদিন সুলতানের কাছে শিকার করিবার অনুমতি লইয়া কয়েকটি মাত্র অনুচর লইয়া বাঙ্গলা দেশে চলিয়া আসিলেন। দিল্লীর সিংহাসনে তাহার কোন লোভ ছিল না, সোনার বাঙ্গলার স্নেহময় ক্রোড়ের আকর্ষণ তাহার সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে নিবৃত্ত করিয়াছিল।

সুলতান তাহার পুত্রের এই ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার জ্যেষ্ঠপুত্রের পুত্র কায়-খসরুকে সুলতান পদে নির্ব্বাচিত করিয়া তিনি দেহত্যাগ করিলেন।

তাহার মৃত্যুর পরে দিল্লীর আমীর ওমরাগণ নাসিরুদ্দিনের পুত্র কায়কোবাদকে সিংহাসনে বসাইলেন, কায়কোবাদের বয়স তখন মাত্র ১৮ বৎসর।

বাঙ্গলায় বিদেশী

এই অল্পবয়স্ক যুবক সিংহাসনে উঠিয়া রাজকার্য্য অকর্ম্মণ্য লোক-দিগের হাতে ছাড়িয়া দিয়া আমোদ প্রমোদের তরঙ্গে নিজেকে ভাসাইয়া দিলেন। বাঙ্গলা দেশে বসিয়া নাসিরুদ্দিন নিজের ছেলের উন্নতিতে যেমনি খুসী হইলেন, তেমনি তাঁহার চরিত্রের অবনতির খবর পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত এবং মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি তাঁহার পুত্রকে অত্যন্ত ভৎর্সনা করিয়া একটি চিঠি লিখিলেন এবং তাঁহার অকর্ম্মণ্য মন্ত্রীটিকে চাকুরী হইতে বিদায় দিতে উপদেশ দিলেন। যখন দেখিলেন যে চিঠিতে কিছুই হইল না, তখন তিনি সংকল্প করিলেন যে দিল্লীতে গিয়া যাহাহৌক একটা ভাল বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তিনি সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া দিল্লীর অভিমুখে রওনা হইলেন, কায়কোবাদও মন্ত্রীর পরামর্শ মত প্রকাণ্ড সৈন্যবাহিনী লইয়া বাঙ্গলার-দিকে অগ্রসর হইলেন। সির্ব্বি নদীর একপারে নাসিরুদ্দিন অপর পারে কায়কোবাদ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন; কিন্তু নাসিরুদ্দিনের মন ছেলেকে দেখার জন্য আকুলি বিকুলি করিতে লাগিল, তিনি এপার হইতে কায়কোবাদকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "তোমাকে দেখার জন্য আমার মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছে আমি আমার মনকে কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছি না, শুধু তোমার সহিত আমি একবার মাত্র দেখা করিয়া বাঙ্গলা দেশে ফিরিয়া যাইব, আর কোনদিন তোমাকে বিরক্ত করিব না।"

কায়কোবাদের মন পিতার চিঠিতে গলিয়া গেল, কিন্তু কাছে

কুপরামর্শ দাতার অভাব ছিল না, তাহারা বলিল, "বাপ হইলে কি হয়, দিল্লীর সুলতানের কখনই বাঙ্গলা দেশের শাসনকর্ত্তার কাছে মাথা হেট করা উচিত নয়।" অতএব ঠিক হইল যে অযোধ্যাদেশে সুলতানের শিবির স্থাপিত হইবে, এবং সেইখানে কায়কোবাদ সিংহাসনে বসিয়া থাকিবেন আর তাঁহার পিতা উপযুক্ত সম্মানের সহিত দিল্লীর সাহেন্‌সাহ্ সুলতানের সহিত দেখা করিবেন। এই ব্যবস্থামত নাসিরুদ্দিনকে সুলতানের সভায় আনা হইল, দূর হইতে প্রথমবার কুর্ণিশ করিয়া তিনি পিছাইয়া গিয়া আবার অগ্রসর হইয়া কুর্ণিশ করিলেন, কায়কোবাদ এতক্ষণ নিজেকে সম্বরণ করিয়াছিলেন, তৃতীয়বার যখন নাসিরুদ্দিন মাথা হেট করিলেন, তখন কায়কোবাদ নিজেকে আর রাখিতে না পারিয়া ঝাপাইয়া গিয়া পিতার কোলে পড়িলেন। অশ্রুজলে দুইজনের মিলন শেষ হইবার পর, কায়কোবাদ হাত ধরিয়া লইয়া পিতাকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজে তাঁহার পায়ের কাছে বসিলেন। বাহিরের লোকেরা সম্রাট্ এবং সম্রাট পিতার-জয়ধ্বনি করিল।

নাসিরুদ্দিন বাঙ্গলাদেশে ফিরিবার আগে কায়কোবাদকে অনেক সৎপরামর্শ দিলেন। মন্ত্রীর অসৎপরামর্শে সুলতান প্রজাদিগের নিকট অপ্রিয়ভাজন হইতেছেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে কাজ হইতে ছাড়াইয়া দিতে বলিলেন। বাপের কাছে যতদিন ছিলেন ততদিন কায়কোবাদ খুব ভালই ছিলেন, কিন্তু যেই তিনি পিছন ফিরিলেন,

অমনি তাঁহার অসৎ সঙ্গীরা ঘিরিয়া ফেলিয়া তাহাকে আমোদ প্রমোদের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিল। ইহার পরিণাম সচরাচর যাহা হয় তাহাই হইল, এই অকালদর্শী যুবককে ঘাতুকের হাতে প্রাণ দিতে হইল।

কায়কোবাদের মৃত্যুর পর খিলিজি বংশের দুই সুলতান জালালুদ্দিন এবং আলাউদ্দিন খিলিজি দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। ইঁহারা প্রবল প্রতাপান্বিত, সেইজন্য নাসিরুদ্দিন স্বাধীন সুলতানের চিহ্নগুলি সরাইয়া ফেলিয়া দিল্লীর অধীনস্থ শাসন কর্ত্তা রূপে অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইয়া দিলেন।

সম্রাট আলাউদ্দিন গোটা বাঙ্গলা দেশকে একজন শাসনকর্ত্তার অধীনে রাখা সম্রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক নয় ভাবিয়া বাঙ্গালা দেশকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া পূর্ব্বদিকের শাসন ভার বাহাদুর খাঁ বলিয়া দিল্লীর একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকের উপর দিলেন। যতদিন আলাউদ্দিন জীবিত ছিলেন ততদিন বাহাদুর খাঁ দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিয়া শাসন কার্য্য চালাইয়াছিলেন। ইঁহার রাজধানী ছিল সোণারগাঁয়ে। নাসিরুদ্দিনের রাজধানী গৌড়ে। আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর বাহাদুর খাঁ বাহাদুর শাহ নাম লইয়া স্বাধীন হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের প্রজাদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিলেন।

এদিকে দিল্লীতে পটের পরিবর্ত্তন হইয়া খিলিজি বংশের শেষ অকর্ম্মণ্য সম্রাট গুপ্ত ঘাতুকের হাতে প্রাণ গেল। দিল্লীতে তোগ্‌লক বংশ প্রতিষ্ঠিত হইল।

বাঙ্গলাদেশে স্বাধীন স্থলতানের প্রতিষ্ঠা।

তোগলক বংশের দ্বিতীয় সম্রাট মহম্মদ সা নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পরে কদ্দর খাঁকে পশ্চিমবঙ্গের এবং বৈরাম খাঁকে পূর্ব্ববঙ্গের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। যখন উন্মাদ সম্রাটটি দিল্লী হইতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া দেওগিরিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যস্ত ছিলেন, তখন সেই স্থযোগে বৈরামখাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার ভৃত্য ফক্রুদ্দিন পূর্ব্ববঙ্গে নিজেকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কদ্দর খাঁ পশ্চিমবঙ্গের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, সম্রাটের হুকুমে তাঁহাকে ফক্রুদ্দিনের বিরুদ্ধে আয়োজন করিতে হইল, কিন্তু যুদ্ধে ফকরুদ্দিন পরাজিত হইয়াও অনুচরদিগকে লোভ দেখাইয়া তাঁহাদের দ্বারা কদ্দর খাঁকে হত্যা করাইয়া উভয় বাঙ্গালার স্বাধীন স্থলতান হইলেন, এই ঘটনাটি বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা; কারণ ইহার পর হইতে বাঙ্গলা প্রকৃত পক্ষে আর কোনদিন পাঠান আমলে দিল্লীর স্থলতানের অধীনস্থ হয় নাই।

স্থলতান ইলিয়াস শাহ।

তোগলক বংশের তৃতীয় সম্রাট ফিরোজশা তোগলক বাঙ্গলা দেশকে জয় করিতে কয়েকবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; বাঙ্গলার স্থলতান তখনকার দিনে—ইলিয়াস খাঁ সামস্থদ্দিন ছিলেন। ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে ফিরোজ শা তোগলক সসৈন্যে বাঙ্গলা আক্রমণ করেন। ইলিয়াস

শা নিজের ছেলেকে পাণ্ডুয়া রক্ষা করিবার ভার দিয়া নিজে একডালা বলিয়া ঢাকার উত্তরে অবস্থিত একটি সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় লইলেন।

ইলিয়াস শাহের ছেলেটি সম্রাট সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবার লোভ না সাম্‌লাইতে পারিয়া পাণ্ডুয়ার বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে গিয়া ফিরোজের হাতে পরাজিত এবং বন্দী হইলেন। ফিরোজ বাঙ্গলার রাজধানী পাণ্ডুয়া অধিকার করিলেন। তাহার পর তিনি দক্ষিণে আসিয়া একডালা অবরোধ করিলেন। ২২দিন অবরোধের পরে ইলিয়াস শাহ দুর্গের বাহিরে আসিয়া ফিরোজকে আক্রমণ করিলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না, তাঁহার সৈন্যেরা সম্রাট্ সৈন্যের আক্রমণের বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া পুনরায় একডালাতে ফিরিয়া আসিল। অবরোধ চলিতে লাগিল।

ইহার মধ্যে একডালার নিকটে রাজা রিয়াবিন নামক একজন মুসলমান ফকির বাস করিতেন, ইলিয়াস তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান এবং শ্রদ্ধা করিতেন। এই সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইলিয়াস ফকিরের বেশ লইয়া তাহার গুরুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিলেন এবং ফিরিবার সময়ে ফিরোজের শিবিরে গিয়া তাহাকে সেলাম করিয়া দুর্গে ফিরিয়া আসিলেন। ফিরোজ জানিতেন না যে যে ফকিরটি তাঁহার সঙ্গে আসিয়া দেখা করিয়া গেলেন তাঁহারই বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য তিনি দিল্লী ছাড়িয়া এতদূরে আসিয়াছেন। যখন তিনি খবর পাইলেন তখন ইলিয়াসের সাহসে যারপরনাই চমৎকৃত হইলেন।

তাহারপরে বর্ষাকাল ঘনাইয়া আসিল। বাঙ্গলা দেশে ঘনঘোর ঘটা করিয়া বর্ষা নামে এবং পূর্ব্ববঙ্গের বিশাল নদীগুলি ফুলিয়া উঠিয়া সমস্ত দেশকে ভাসাইয়া দেয়। এইরূপ অবস্থায় যুদ্ধ চলে না; সেইজন্য ফিরোজ শা তোগ্‌লককে অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত ইলিয়াস শাহের সহিত সন্ধি করিয়া দিল্লীতে ফিরিতে হইল। ইলিয়াস শাহ্‌ যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন নানা মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাইয়া সম্রাটকে খুসী রাখিয়াছিলেন।

ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেকন্দর শাহ্‌ বাঙ্গলার মসনদে আরোহণ করেন। সেকন্দর শাহের দুইটি বেগম ছিল। একটি বেগমের গর্ভে তাহার ১৭টি ছেলে পিলে হয়, আর একটির গর্ভে ঘিয়াসুদ্দিন বলিয়া একটি ছেলে হয়। ঘিয়াসুদ্দিন চরিত্রে এবং লেখা পড়ায় অন্যান্য ভাইয়ের অপেক্ষা ভাল ছিলেন সেইজন্য বড় বেগম সাহেবাটি তাহার স্বামীকে সর্ব্বদাই ঘিয়াসুদ্দিনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার অবসর খুঁজিতেন। একদা সুলতানকে নিভৃতে পাইয়া বেগম সাহেব তাহাকে বলিলেন যে সুলতান যদি তাহার কাছে প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি তাঁহাকে যে কথা বলিবেন তাঁহা আর কাহারও কাছে বলিবেন না তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে একটি সংবাদ জানাইতে পারেন; সেকন্দর শাহ্‌ প্রতিশ্রুত হইলে তাঁহার বড় বেগমটি বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিলেন যে ঘিয়াসুদ্দিন তাহার নিজের ভাইদের বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই ষড়যন্ত্র করিতেছে এবং

অবসর খুঁজিয়া বেড়াইতেছে যে কখন সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারে; অতএব যদি সুলতান তাহার নিজের এবং পুত্রদের জীবন মূল্যবান মনে করেন তাহা হইলে অনতিবিলম্বে যেন ঘিয়াসুদ্দিনের চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাঁহাকে অন্ধ করিয়া ফেলেন, না হয়ত তাহাকে যাবজ্জীবন বন্দী করিয়া রাখেন। সেকন্দর শাহ রাণীর ধূর্ত্ত ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "অকৃতজ্ঞ, ভগবান তোমাকে অনেক সন্তান দিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ উপযুক্ত বয়স্ক হইয়াছে, ইহাতেও তুমি খুসী না হইয়া তোমার সতীনের একমাত্র পুত্রকে বিনাশ করিতে চাও, তুমি দূর হইয়া যাও, আমি তোমার কথা শুনিব না।"

এই কথা ঘিয়াসুদ্দিনের কানে কেমন করিয়া গেল তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু তিনি বিমাতার ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়া বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার পক্ষে রাজপ্রাসাদে বাস করা নিরাপদ নহে, তিনি সোণার গাঁয়ে পলাইয়া গিয়া সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। সুলতানের সহিত গোয়াল পাড়ায় তাঁহার একটি যুদ্ধ হয়। যদিও ঘিয়াসুদ্দিন তাঁহার অনুচর বৃন্দকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "খবরদার তোমরা যেন কখনও সুলতানের উপরে কোন অস্ত্র নিক্ষেপ করিও না"; কিন্তু যুদ্ধের গোলমাল কেমন করিয়া একটি অস্ত্র সুলতানের উপর পড়িল, সুলতান আহত হইয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ঘিয়াসুদ্দিন যখন এই কথা শুনিলেন তখন সমস্ত ভুলিয়া গিয়া পিতার নিকটে ছুটিয়া গেলেন, আহত পিতার

মাথাটি কোলে লইয়া পিতৃভক্ত ঘিয়াসুদ্দিন অনুতাপের অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। সুলতান তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বৎস আমার কাজ শেষ হইয়াছে, তোমার রাজ্য সমৃদ্ধিশালী হউক।"

পিতার সৎকারের আদেশ দিয়া ঘিয়াসুদ্দিন অনতিবিলম্বে পাণ্ডুয়ায় চলিয়া আসিলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সতাতো ভাইদের ধরিয়া তাহাদের চোখ কানা করিয়া দিলেন। কিন্তু ঘিয়াসুদ্দিন নিষ্ঠুর ছিলেন না, তিনি ন্যায়পরায়ণ সুলতান ছিলেন। একদিন তিনি ধনুর্ব্বাণ অভ্যাস করিতেছিলেন, একটি তীর হঠাৎ গিয়া একটি বিধবার ছেলের উপর পড়িয়া তাহাকে জখম করিল; বিধবাটি সহরের কাজীর কাছে গিয়া সুলতানের নামে নালিশ করিল, কাজীর নাম ছিল সিরাজউদ্দিন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে তিনি যদি রাজার উপরে শমনজারি করেন তাহা হইলে হয়ত রাজা তাহা মান্য করিবেন না কিন্তু তাহা যদি তিনি না করেন তাহা হইলে ভগবানের কাছে তাঁহাকে জবাবদিহি থাকিতে হইবে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি সুলতানের উপর আদালতের শমনজারি করাই ঠিক করিলেন। যে লোকটিকে তিনি শমন দিয়া পাঠাইলেন সুলতানের কাছে তাহার পঁহুছানোই ছিল অসম্ভব। সে লোকটা একটা ফন্দী করিয়া রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী একটি মসজিদের উপরে উঠিয়া অসময়ে লোককে নমাজ পড়িতে আহ্বান করিল। রাজবাড়ীর পেয়াদারা

রাজার আদেশে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাজার কাছে নিয়া গেল, তখন কাজীর কর্ম্মচারীটি তাহার মনিবের শমন সুলতানের উপর জারী করিল। সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন তাঁহার পোষাকে একটি ছোট তরোবারি লুকাইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে কাজীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। কাজী বিচার করিয়া সুলতানের জরিমানা করিলেন, সুলতান সেই টাকা দিয়া বিধবাটিকে খুসী করিলেন, যখন বিধবা চলিয়া গেল, তখন কাজী তাঁহার বিচারের আসন হইতে নামিয়া আসিয়া সুলতানকে যথাযোগ্য ভাবে অভ্যর্থনা করিলেন। সুলতান তখন তাঁহার পোষাকের মধ্য হইতে তরোবারিটি বাহির করিয়া তাহা কাজীকে দেখাইয়া বলিলেন, "কাজী তোমার শমন অমান্য না করিয়া আমি বিচার স্থানে আসিয়াছি। যদি তুমি বিচারে কোন গোলমাল করিতে তাহা হইলে আমি এই তরোবারি তোমার বুকে বসাইয়া দিতাম; কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমার একজন ন্যায়বান বিচারক আছেন যিনি ভগবানের আদেশের উপর কাহাকেও মান্য করেন না"। কাজীও একটি চাবুক বাহির করিয়া বলিলেন যে যদি সুলতান একটুও তাঁহার আদেশ অমান্য করিতেন তাহা হইলে তিনিও চাব্‌কাইয়া তাঁহার পিঠ লাল করিয়া দিতেন। সুলতান খুব খুসী হইয়া কাজীকে প্রচুর পুরস্কার দিয়া চলিয়া গেলেন।

ঘিয়াসুদ্দিন যখন বাঙ্গলার মসনদে তখন পারস্য দেশের কবি ছিলেন হাফিজ, ঘিয়াসুদ্দিন হাফিজকে বাঙ্গলায় আনাইবার জন্য

অনেক চেষ্টা করিয়া ছিলেন, কিন্তু এতদূরে কবি আসিতে রাজি হন নাই।

রাজা গণেশ।

উত্তর বঙ্গে চলন বিল বলিয়া একটি বিখ্যাত বিল আছে। গৌড়ের সুলতান চলনবিলের দক্ষিণে শিখাই সন্ন্যালকে সাঁতোড় গ্রাম এবং উত্তরে সুবুদ্ধি খাঁ বলিয়া আর একজন ব্রাহ্মণকে একটাকিয়া নামে একটি জায়গীর দিয়াছিলেন। চলনবিলের অধিকার লইয়া জমিদার দুইটির মধ্যে ঝগড়া হইতে থাকে, এদিকে কিন্তু চলনবিলের মধ্যে দুইটি দ্বীপ অধিকার করিয়া শ্যামচাঁদ এবং রামচাঁদ দুইটি কায়স্থ জলদস্যু বৃত্তি আরম্ভ করিল, তাহারা বিলের মধ্যে নৌকা লুঠ করিত এবং চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে পড়িয়া লুঠতরাজ করিত। পরে তাহাদের সাহস বাড়িয়া গেল, পদ্মা এবং মেঘনা নদীতে তাহারা তাহাদের দ্রুতগামী পানসী করিয়া জলযাত্রীর উপর ভীষণ অত্যাচার করিত। গৌড়ের সুলতান অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাদের কিছু করিতে পারেন নাই। অবশেষে সাঁতোড়ের রাজা অবনীনাথ রামা শ্যামার গুরুঠাকুর কালীকিশোর আচার্য্যের সাহায্যে এই প্রবল জলদস্যু দুইটির সহিত সন্ধি করিলেন তাহাদিগকে সামান্য খাজনায় বিস্তর

জায়গা জমি দান করিয়া নিজের অধীনে রামা শ্যামাকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন। চলনবিলের অধিকার লইয়া সাঁতোড়ের অবনীনাথের সহিত ভাদুরিয়ার জমাদারের বিবাদ আগে হইতেই চলিতেছিল, কিন্তু কালীকিশোর আচার্য্যের মধ্যবর্ত্তিতায় এই বিবাদেরও নিষ্পত্তি হইল। একটাকিয়ার জমিদার রাজা গণেশের পুত্র যদুর সহিত কালীকিশোরের ঘটকালিতে অবনীনাথের কন্যা নবকিশোরীর বিবাহ হইল, রাজা অবনীনাথ চলনবিলের উত্তরার্দ্ধ এবং বহুলক্ষ টাকা যৌতুক স্বরূপ তাঁহার জামাইকে দিলেন ইহার কিছুকাল পরে গৌড়ের সুলতান পদপ্রার্থী ঘিয়াসুদ্দিনের দুইটি বংশধরের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইলে রাজা গণেশ একজনের পক্ষ লইয়া তানোরের যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিয়া নিজে গৌড়ের সিংহাসন আরোহণ করিলেন। পাঠান সুলতানের বেগমগণ রাজা গণেশের বেগম হইলেন। আজিম শা নামক একজন প্রতিপক্ষ সুলতানের আশমানতারা নামে অপূর্ব্ব সুন্দরী একটি কন্যা ছিল। এই সুলতান কন্যার সহিত যদুর প্রণয় হয়। যখন মেয়েটির বয়স হইল তখন তিনি স্বেচ্ছায় যদুর সঙ্গে মিলিত হইলেন। রাজা অনেক মুসলমান বেগমদিগকে গোপনে নিকা করিয়াছিলেন, তিনি যখন গৌড়ে থাকিতেন তখন তাঁহার আচার ব্যবহার মুসলমানের মতন ছিল, তখন তিনি সেখানে বেগমদিগের নামে অনেকগুলি দর্গা এবং মসজিদ নির্ম্মান করিয়া দিয়াছিলেন। যখন তিনি পাণ্ডুয়ায় থাকিতেন তখন তাঁহার আচার

ব্যবহার ছিল খাঁটী হিন্দুর মতন ; তিনি পাণ্ডুয়ার অনেক হিন্দুর দেব-দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি কাহারও ধর্ম্মে হাত দিতেন না, তাঁহার ন্যায় বিচারে হিন্দু মুসলমান উভয়েই সুখী ছিল। তাঁহার যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁহার দেহের সৎকার লইয়া হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া হয়, কারণ তাহারা তাহাকে এত ভালবাসিত।

রাজা গণেশের মৃত্যুর পর যদুনারায়ণ গৌড়ের স্বাধীন নরপতি হইলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সুলতান কন্যা আশমানতারা যদুনারায়ণের প্রতি আসক্ত হন, এবং উভয়েই স্বামী-স্ত্রীর মতন বাস করিতে থাকেন। আশমানতারার যখন সন্তান সম্ভাবনা হইল, তখন একদা তিনি যদুনারায়ণকে বলিলেন, "মহারাজ আমি সুলতান-কন্যা কিন্তু আমাদের পরস্পরের বিবাহ না হওয়াতে লোকে যে আমার সন্তানকে অবহেলার চক্ষে দেখিবে তাহা আমি কেমন করিয়া সহ্য করিব? আপনি আমাকে শাস্ত্র মতন বিবাহ করুণ সে হিন্দুর শাস্ত্রই হউক কিংবা মুসলমানের শাস্ত্রই হউক।" যদুনারায়ণ বাঙ্গলা দেশের বড় বড় হিন্দু পণ্ডিত ডাকাইয়া তাহাদের ব্যবস্থা নিলেন, তাঁহারা বলিলেন হিন্দুর ধর্ম্মমতে মুসলমান ও হিন্দুর বিবাহ কখনও হইতে হইতে পারে না। অগত্যা বাধ্য হইয়া যদুনারায়ণ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা লইয়া আশমানতারাকে মুসলমান ধর্ম্ম অনুসারে বিবাহ করিলেন। যদুনারায়ণ এখন হইতে জেলালুদ্দিন নাম লইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার খবর যখন পাণ্ডুয়ায় গেল তখন তাঁহার হিন্দুপত্নী নবকিশোরী তাঁহার অপরাপর সপত্নী ও শাশুড়ী ত্রিপুরাদেবীকে লইয়া গৌড়ে চলিয়া আসিলেন, নবকিশোরী রাজপ্রাসাদে আসিয়া খড়্গ হাতে আশমানতারাকে কাটিতে ছুটিলেন তাঁহার আসার খবর পাইয়া যদুনারায়ণ আশমানতারা বেগমকে লইয়া দুর্গের এক কোনে পলাইয়া রহিলেন, তাঁহার আদেশে দুর্গ দ্বার বন্ধ হইল; যখন নবকিশোরীর রোষ ব্যর্থ হইল তখন তিনি তাঁহার স্বামীর পরিবর্ত্তে তাঁহার নাবালক পুত্র অনুপনারায়ণকে গৌড়ের মসনদে বসাইতে চাহিলেন, কিন্তু যদুনারায়ণের দেওয়ান বলিলেন তাহা অসম্ভব, কারণ বাঙ্গলা দেশে তখন আফগান শক্তি প্রবল, তাহারা সকলেই যদুর জন্য লড়াই করিবে, তাঁহারই পরামর্শমতে নবকিশোরী তাঁহার সকল আত্মীয় স্বজন লইয়া ভাদুরিয়ায় চলিয়া গেলেন, ইহার পর হইতে তাঁহারা মুসলমান যদুনারায়ণের সহিত সকল সংশ্রব ত্যাগ করিলেন।

জেলালুদ্দিনের মৃত্যুর পর আশমানতারার গর্ভজাত পুত্র আহ্‌মদ শা গৌড়ের সুলতান হন, কিন্তু তিনি তাহার সতাতে ভাই অনুপনারায়ণের সহিত বরাবর সদ্ব্যবহার করেন, যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হইলে আশমান-তারা তাহার সতীন নবকিশোরীর নিকট আশ্রয় লইয়া বাকী জীবন বৈষ্ণবীর মতন হরিণাম লহিয়া কাটাইয়া দিলেন।

আহমদ শার মৃত্যুর পর ইলিয়াস্ শাহের বংশধর নাশির শাহ বাঙ্গলার সুলতান হইলেন। এই বংশের শেষ সুলতান ফতেশাকে রাজ-প্রাসাদের পাইকগণ হত্যা করিয়া হাব্সী ক্রতদাসের প্রধান-ব্যক্তি বারিককে তাহারা গৌড়ের মস্নদে বসাইল। যে সময়ে এই ষড়যন্ত্রে একজন ক্রীতদাস বাঙ্গলার সুলতানপদ পাইল, সে সময়ে সুলতানের দুইটি প্রধান কর্ম্মচারী সেনাপতি খানজাহান এবং মালিক আন্দিয়েল রাজধানীর বাহিরে সুলতানের বিদ্রোহী রাজাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাঁহারা তখনকার মতন বারিককে সুলতান বলিয়া মানিয়া লইলেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কি করিয়া এই নীচ ব্যক্তিকে সিংহাসন হইতে সরাইবেন তাহার ফন্দী আটিতে লাগিলেন। এই নূতন সুলতানের শয়নকক্ষের পাহাড়ায় মুল্‌ক্ আন্দিয়েলের স্বজাতি কয়েকটি হাব্সি ছিল, তিনি তাহাদের সাহায্যে একদিন রাত্রিতে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। সেই দিন রাত্রিতে সুলতান মেয়েলোকের পোষাক পরিয়া গানবাদ্য এবং মদের উত্তেজনায় বিকল হইয়া মাটিতে পড়িয়াছিলেন, এই অবসরে মুল্‌ক্ আন্দেয়েলের সাহায্যকারী হাবসী বাতি নিবাইয়া দিয়া অনুচরদিগের সহিত সেনা-পতিকে গুপ্ত দ্বার খুলিয়া সুলতানের কক্ষে ঢুকিতে দিলেন। বারিকের শরীরে খুব জোর ছিল, তিনি মুলকের দুই একবার তরোবারির খোঁচা খাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া সেনাপতিকে শক্ত

করিয়া জড়াইয়া ধরিলেন, অন্ধকারে ধ্বস্তাধস্তি হইতে লাগিল। তখন মুল্‌ক্ নিজের অনুচরদিগকে ডাকিয়া সুলতানকে মারিয়া ফেলিতে বলিলেন, অন্ধকারে সাবধানে তাহারা বারিকের শরীরে কয়েকটি খোঁচা মারিতে তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন, সকলে ভাবিল যে সুলতান মারা গিয়াছে, তখন মুলক নিজের বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন; কিন্তু রাত্রিতে সুলতানের বিশ্বাসঘাতক ক্রীতদাস আসিয়া খবর দিল—যে সুলতান মরে নাই, বাঁচিয়া আছে, তাহাকে যদি না মারিয়া ফেলা হয় তাহা হইলে কাল সকালে কাহারও প্রাণ থাকিবে না, তখন মুল্‌ক্ ফিরিয়া গিয়া আরব্ধ কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিলেন; পরদিন প্রভাতে তিনি সুলতান ফিরোজ শাহ হাব্‌সী উপাধি লইয়া বাঙ্গলার সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। যদিও সুলতানকে হত্যা করিয়া ফিরোজ় শা বাঙ্গলার সিংহাসন অধিকার করেন তথাপি, তিনি ন্যায়পরায়ণ এবং দানশীল ছিলেন। একটি গল্প আছে, যে তিনি একদা মন্ত্রীকে একলক্ষ টাকা গরীব দুঃখীকে বিলাইয়া দিতে হুকুম দিয়াছিলেন। মন্ত্রী ভাবিলেন যে সুলতান একলক্ষ টাকা যে কতখানি তাহা নিশ্চয় জানেন না, যে ঘরের মধ্য দিয়া সুলতান সকল সময়ে যাতায়াত করেন সেই ঘরে মন্ত্রী একলক্ষ টাকা স্তূপাকার করিয়া রাখিলেন। হয়ত সুলতান টাকার পরিমাণ দেখিয়া লক্ষ টাকার দর বুঝিতে পারিবেন। সুলতান যখন সেই ঘরের মধ্য দিয়া যাইবার সময় টাকার স্তূপ দেখিয়া

অন্ধকারে ধস্তাধস্তি চলিতে লাগিল

পৃঃ ৩৮—বাঙ্গলার বিদেশী।

জিজ্ঞাসা করিলেন "টাকা কিসের জন্ত"। মন্ত্রী বলিলেন যে "এই টাকাই তিনি সকালে গরীবদিগের মধ্যে বিতরণ করিবার হুকুম দিয়াছেন", রাজা মন্ত্রীর উদ্দেশ্ত বুঝিতে পারিলেন, তিনি বলিলেন, "এত সামান্ত টাকা দিয়া কি হইবে, ইহার দ্বিগুণ দিও।"

ফিরোজ শা হাব্‌সীর মৃত্যুর পরে বাঙ্গলার মসনদে যে সকল রাজা বসিয়াছিলেন তাহার মধ্যে সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শা এবং নসরৎ শার নাম উল্লেখ যোগ্য। সুলতান আলাউদ্দিন সৈয়দবংশজাত, ইনি মক্কা হইতে বাঙ্গলায় আসিয়া সামান্ত চাকুরী করিতেন, কিন্তু ইহার বংশ পরিচয় পাইয়া চাঁদপুরের কাজি তাঁহার সহিত তাঁহার মেয়ের বিবাহ্ দেন, ইহার পরে তিনি সুলতানের অধীনে বড় কাজ পান। তাহার পরে যখন সুলতানের মৃত্যুর পর গৌড়ের সিংহাসন খালি হইল তখন আমীর ওমরাওগণ আলাউদ্দিনকে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে সুলতান পদে বসাইলেন।

সুলতান আলাউদ্দিন আসাম দেশ জয় করিবার জন্ত তাঁহার পুত্রকে অনেক সৈন্ত সামন্ত দিয়া পাঠাইলেন সেনাপতি অনায়াসেই এই দেশটি অধিকার করিলেন। কিন্তু আসাম জয় করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়, কামরূপের রাজারা বিলক্ষণ জানিতেন, যে বর্ষার সময় তাঁহারা এই মুসলমান

আক্রমণকারীদিগকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিতে পারিবেন। যখন বর্ষার প্লাবনে পার্ব্বত্য পথগুলি ডুবিয়া গেল, এবং ব্রহ্মপুত্র নদের ছোট ছোট শাখা উপশাখাগুলি পাহাড় হইতে লাফাইয়া লাফাইয়া পড়িয়া সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপুত্রনদের দিকে ছুটিল, তখন কামরূপের রাজা পথঘাটগুলি সৈন্ম সামন্ত লইয়া অধিকার করিয়া বিজেতাদিগের রসদ পহুঁছান বন্ধ করিয়া দিলেন। না খাইয়া মানুষ লড়িতে পারে না। মুসলমানগণ অগত্যা নানা বিপদ এবং বাধা অতিক্রম করিয়া দেশে ফিরিয়া গেল।

লোদীবংশের বাদশাহ সেকন্দরের সহিত ইনি সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বিহার ত্রিহুত সারণ তাহাকে ছাড়িয়া দেন। ইনি ১৫২০ খৃষ্টাব্দে দেহ ত্যাগ করেন।

সুলতান আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যৈষ্ঠপুত্র নশ-রৎ শাহ বাঙ্গলার সুলতান হইলেন। ইঁহার রাজত্বের সময়ে মোগল ও পাঠানের সংঘর্ষে পাঠান সর্ব্বত্র পরাজিত হইতে থাকে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাঠান বাঙ্গলা দেশে আসিয়া সুলতানের আশ্রয় গ্রহণ করিল, সুলতান ইব্রাহিম্ লোদীর ভাই মহম্মদ লোদী পাণিপথের যুদ্ধের পরে বাঙ্গলাদেশে পলাইয়া আসেন। নশরৎ শাহ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার পদের উপযুক্ত যায়গা জমি দান করিলেন। সঙ্গে মহম্মদ তাহার ভগিনীকে আনিয়াছিলেন, নশরৎ ধুমধামের সহিত তাহাকে বিবাহ করিলেন।

বাবর এই সমস্ত খবর পাইয়া বাঙ্গলা দেশ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু স্থলতান যুদ্ধ অপেক্ষা শান্তি ভালবাসিতেন, তিনি বিস্তর উপঢৌকন দ্বারা সম্রাটকে তুষ্ট করিলেন; এবং পরে সন্ধি করিলেন যে তিনি আর কখনও আফগান দিগকে সাহায্য করিবেন না।

কিন্তু বাবরের মৃত্যুর পরে আফগানদিগের মধ্যে সর্ব্বত্র সাড়া পড়িয়া গেল, বাঙ্গলার স্থলতান গুজরাটের স্থলতানের সঙ্গে সন্ধি করিবার জন্য দূত পাঠাইলেন, আফগানরা চতুর্দ্দিকে যুদ্ধ সাজ করিতে আরম্ভ করিল। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে নশরৎ শা গুপ্ত ঘাতুকের হস্তে প্রাণ দিলেন। তাহার উত্তরাধিকারী মহম্মদ শা বিহারের শাসনকর্ত্তা সের শাহের হাতে পরাজিত হইয়া হুমায়ুনের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কি করিয়া বিহারের একটি ছোট জায়গীরদারের পদ হইতে বিমাতার চক্রান্তে ফরিদ খা জৌনপুরের স্থলতানের অধীনে সামান্য সৈনিকের পদ হইতে সাহসে এবং বিক্রমে উচ্চপদ পাইয়া বিমাতার চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া প্রথমে নিজের সম্পত্তি পাইলেন, তাহার পরে বিহারের শাসনকর্ত্তাকে সরাইয়া দিয়া নিজে বিহার গ্রহণ করিলেন, তাহার পরে ষড়যন্ত্র এবং বিবাহের দ্বারা রোটাস এবং চুনারের দুর্গ দখল করিয়া মহম্মদকে হারাইয়া দিয়া বাঙ্গলা দেশ অধিকার করিয়া হিন্দুস্থানের মোগল বাদসা হুমায়নকে কাণোজের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসের কথা। সের

শার মত সুশাসক পাঠানদিগের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই; তিনি তাঁহার হিন্দু মন্ত্রী টোডরমলের সাহায্যে যে জরিপের এবং খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করেন তাহা আকবর গ্রহণ করেন। যুদ্ধ এবং অশান্তির মধ্যে থাকিয়াও তিনি বাঙ্গলা হইতে ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল পর্য্যন্ত রাস্তা তৈয়ার করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজও Grand Trunk Road নামে পরিচিত। সের শা মাত্র দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহার মৃত্যুর পরে পাঠান গৌরব-সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল। ইহার অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের অধীনে চারিদিকে বিদ্রোহ এবং অশান্তি-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। অবশেষে আকবর এবং তাঁহার সেনাপতি বৈরাম খাঁ পাঠান সুলতান এবং তাঁহার হিন্দু সেনাপতি হিমুকে তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। আকবরের বয়স তখন চৌদ্দ বৎসর এই বালকটি এখন হইতে ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা হইল, অবশেষে অভিভাবক বৈরাম খাঁর হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া যোলো বৎসর বয়সে আকবর হিন্দুস্থানের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। পাঠানগণ চারিদিকে নিজেদের ক্ষমতা সংযত করিয়া আকবরকে নগণ্য বালক মনে করিয়া মোগল দিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল, হিন্দু রাজপুত্রগণ তাহাদের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়া নিজেদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন। অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণও নিজদিগকে স্ব স্ব

প্রধান বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। এই বিপদের মধ্যে রাজলক্ষ্মী একটি নিঃস্ব বালককে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইলেন। ভারত-বর্ষের ইতিহাসে আকবরের মতন শাসনকর্ত্তা বিরল, তিনি হিন্দুস্থানের বিভিন্ন জাতি এবং ধর্ম্মের মধ্যে যে ঐক্য এবং সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহার মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা কিংবা স্বার্থবুদ্ধি ছিলনা। তিনিই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক যে মুক্তির পথনির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা যেমন তখনকার দিনের পক্ষে একমাত্র পথ ছিল, আজও তেমন আছে।

সুলতান সুলেমান শা কেরানি।

আকবর যখন দিল্লির বাদসাহ, তখন বাঙ্গলার সুলতান সুলেমান সা কেরানি। ইনি পূর্ব্বে নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন, তখন তাঁহার নাম ছিল কালিদাস গজদানী। ইনি বাঙ্গলার সুলতান জেলালুদ্দিনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। প্রতিদিন ব্রাহ্মণকে তিনি একটি সোনার হাতী দান করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে গজদানী বলিত। ইনি অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন, এবং বিদ্যা ও বিচক্ষণতায় তাঁহার মতন লোক তখন কেহই ছিল না।

সুলতান জেলালুদ্দিনের মামিনা খাতুন বলিয়া অপূর্ব্ব সুন্দরী একটি কন্যা ছিল। তাঁহার সৌন্দর্য্যের খ্যাতি শুনিয়া দেশ বিদেশ

হইতে রাজপুত্র তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য গৌড়ে আসিয়াছিলেন, কিন্তু রাজকন্যা কাহাকেও পছন্দ করেন নাই বলিয়া তাহাদিগের সকলকেই ফিরিয়া যাইতে হইল। একদা সুলতানা যখন ঘাট হইতে স্নান করিয়া ফিরিতেছিলেন তখন পথে কালিদাস গজদানীকে দেখিয়া তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িলেন, তিনি মনে মনে তাঁহাকে তাঁহার সমস্ত হৃদয় দান করিলেন। রাজপ্রাসাদে আসিয়া তাঁহার ক্ষুধা গেল, নিদ্রা গেল সমস্ত দিন রাত কি করিয়া তাঁহার কামনার ধনকে পাইতে পারিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন, অবশেষে তাঁহার ভালবাসা আর গোপন করিতে না পাইয়া তিনি একটি পত্র লিখিয়া কালিদাস গজদানীর কাছে পাঠাইলেন সেই পত্রে তিনি তাঁহার দেহ মন সকলই তাঁহার পায়ে নিবেদন করিলেন, কিন্তু কালিদাস উত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন, "হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিবাহ হইতে পারে না। আমি আপনার জন্য কখনও হিন্দু ধর্ম্ম ছাড়িয়া মুসলমান হইতে পারিব না।"

মামিনা খাতুন কালিদাস গজদানীর নিষ্ঠুর উত্তর পাইয়া মর্ম্মাহত হইলেন, তিনি প্রথমে আত্মহত্যা করিয়া তাঁহার নিষ্ফল জীবন ত্যাগ করিবার সংকল্প করিলেন কিন্তু পরে তিনি কালিদাস গজদানীর অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য মনে মনে মতলব আঁটিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া আনাইয়া তাহাকে বিস্তর টাকা পয়সার লোভ দেখাইয়া

হিন্দু মন্ত্রীর জাতি নাশ করিবার একটা ফন্দী ঠিক করিলেন। পরদিন রাত্রে রাজপ্রাসাদ হইতে গরুর মাংসের কাবাব্ এবং অন্যান্য নানা রকমের সুখাদ্য খাবার তৈয়ার হইয়া পাচক ব্রাহ্মণের নিকট আসিল, ব্রাহ্মণটি সেগুলি ভাল করিয়া সাজাইয়া তাঁহার প্রভুর কাছে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আজ আমার একজন আত্মীয় দেশ হইতে আসিয়াছেন। তিনি আপনার জন্য এই সকল নূতন খাবার তৈয়ারি করিয়াছেন, আপনি যদি এইগুলি খান তাহা হইলে আমার আত্মীয়টি কৃতার্থ হইবে।" কালিদাস রাজ-বাড়ীর খাবারগুলি খুব তৃপ্তির সহিত খাইলেন, এবং বারংবার রান্নার প্রশংসা করিলেন ; আহারের পর সুনিদ্রা হইল। পরদিন সকালবেলায় ব্রাহ্মণ পাচকটি আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "প্রভু, গত রাত্রিতে যে সকল মাংস আপনি তৃপ্তির সঙ্গে খাইয়া আমার আত্মীয়ের রান্নার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা গোমাংস, সেইজন্য আপনার জাত গিয়াছে, অতএব আমি আর আপনার কাছে চাকুরী করিব না ; এই বলিয়া সে ছুটিয়া রাজপ্রাসাদে চলিয়া গেল।

কালিদাস এই শুনিয়া শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন, "আমি কাহার কি অপকার করিয়াছি যে আমার সে এত বড় শত্রুতা সাধিল, আমার ধর্ম্ম এবং জাত গিয়াছে, এই ছার দেহ রাখিয়া আমার কি হইবে ? আমি তুষানলে প্রবেশ করিয়া আমার এই

পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।” এই বলিয়া তিনি বিলাপ করিতে লাগিলেন, এবং পথে পথে পাগলের মতন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

সুলতানের কাণে তাঁহার মন্ত্রীর এই দুর্দ্দশার কথা গেল। তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কালিদাস যখন তাঁহার কাছে আসিলেন তখন তিনি তাঁহাকে নানারকমের সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন যে “এমন করিয়া পাগলের মতন থাকিলে কি হইবে? খোদা যেমন হিন্দুরও তেমনি তিনি মুসলমানেরও,—হিন্দুদের মধ্যে যখন তোমার জাত গিয়াছে তখন তুমি মুসলমান হইয়াছ, তুমি আমার পরমাসুন্দরী মেয়েকে বিবাহ কর, আমার মৃত্যুর পর আমার যাহা আছে তাহা ত তুমি পাইবেই, তাহা ছাড়া আমার পরে তুমি বাঙ্গলার সুলতান হইবে।”

কালিদাস সুলতানের কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন, তিনি দেখিলেন যে তিনি শত চেষ্টা করিয়াও হিন্দু সমাজে ঢুকিতে পারিবেন না, মুসলমান হইলে তাঁহার বিস্তর সুবিধা; তিনি তখন মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষা লইয়া সুলেমান খাঁ নাম গ্রহণ করিয়া মামিসা খাতুনকে বিবাহ করিলেন, এবং যখন সুলতান জেলালুদ্দিনের মৃত্যু হইল তখন তিনি সুলেমান সা কেরানি নাম লইয়া গৌড়ের মসনদে বসিলেন।

সুলেমান সা কেরানি।

সুলেমান শা কেরানি আকবরের কাছে বিস্তর উপঢৌকন পাঠাইয়া নিজেকে আকবরের অনুগত স্বীকার করিলেন। আকবর খুসী হইয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলেন না, ফলে বাঙ্গলা দেশে সুলেমানের রাজত্বের সময় কোন যুদ্ধবিগ্রহ হইল না, কিন্তু তিনি বাঙ্গালী সৈন্য লইয়া উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া সেই দেশটী জয় করিলেন, কুচবিহার লুটপাট করিলেন, এবং পরে যখন উড়িয়ারা তাঁহার নিযুক্ত শাসনকর্ত্তাকে হত্যা করিল, তখন তিনি পুনরায় উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া সেখানে নিজের আধিপত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

বাঙ্গলাদেশের শেষ স্বাধীন সুলতান দায়ুদ খা সুলেমান শার প্রথম পুত্র; সুলতানের পদবী লাভ করিয়া তিনি সম্রাট আকবরের সহিত বল পরীক্ষা করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন, সুলেমানের সুশাসনে রাজকোষে ধনরত্নের অভাব ছিল না, সৈন্য সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল, সেইজন্য তিনি ভাবিলেন যে হিন্দুস্থানের বাদশার সহিত লড়াই করিলে তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিবেন। দায়ুদ খা নিজের নাম টাকায় মুদ্রিত করিলেন, স্বাধীন সুলতানের চিহ্ন স্বরূপ রাজচ্ছত্র ব্যবহার করিতে লাগিলেন, এবং অবশেষে আকবরের অধীনস্থ

দেশ আক্রমণ করিলেন। আকবর মুনিম খাঁ নামক তাঁহার বিশ্বস্ত সেনাপতিকে পাঠাইলেন, ইনি সহজেই পাটনার কাছে দায়ুদখার সেনাপতি লোদি খাঁকে যুদ্ধে হারাইয়া দিয়া সন্ধি করিয়া পাঠান সৈন্যদলকে ধ্বংশের মুখ হইতে রক্ষা করিলেন; ইহাতে আকবর চটিয়া গিয়া তাঁহার বিশ্বাসী হিন্দুসেনাপতি টোডরমলকে দায়ুদখার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন, মুনিম খা আকবরের বিরক্তির কথা জানিতে পারিয়া পুনরায় দায়ুদখার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

পাটনায় দায়ুদ খা এবং গঙ্গার ওপারে হাজিপুরে তাহার শাসনকর্ত্তা উভয়েই খুব সাহসের সহিত যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন, মুনিম খাঁ পাটনা অবরোধ করিলেন, এবং হাজীপুরের পাঠান ফৌজদার আক্রমণ করিলেন। ইতিমধ্যে আকবর পাটনার নিকটে আসিয়া পঁহুছিয়া তাহার সেনাপতির সাহস এবং নৈপুণ্য দেখিয়া খুসী হইলেন। হাজিপুরের শাসনকর্ত্তা যুদ্ধে নিহত হইলে মুনিম খাঁ তাঁহার মাথা এবং অপরাপর নিহত পাঠান অনুচরদিগের মাথা কাটিয়া একটি নৌকা করিয়া পাটনায় পাঠাইয়া দিলেন। দায়ুদ খা বুঝিতে পারিলেন যে যুদ্ধে পরাজিত হইলে তাঁহার উদ্ধার নাই, সেইজন্য টাকা পয়সা যাহা তিনি পাটনায় আনিয়াছিলেন তাহা লইয়া বাঙ্গলায় পলাইয়া গেলেন। পাটনায় দায়ুদ খাঁর বিশ হাজার সৈন্য এবং অসংখ্য হাতী ছিল। দায়ুদ খার পলায়নের পর তাঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া যে যেদিকে পারিল

পলাইয়া গেল, পিছনে মোগল অশ্বারোহী সৈন্য, সামনে নদীর উপরে পুল। পলাতক সৈন্যদের পায়ের চাপে পুলটি ভাঙ্গিয়া পড়িল, অধিকাংশ সৈন্য মোগল অশ্বারোহীর তরবারিতে এবং বাকি যাহারা ছিল তাহারা নদীর স্রোতে প্রাণ হারাইল। পাটনা জয়ের ফলে আকবরের হাতে অসংখ্য হাতী এবং ধনরত্ন আসিল।

সুলতান দাযুদ খাঁ বাঙ্গলা দেশে প্রবেশ করিবার পথে তিরিয়াগলির সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্মের দুর্গগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। এই পথটি এত দুর্গম ছিল যে পাঠানগণ অনায়াসেই একবৎসর পর্যন্ত এইখানে মোগলদিগের আক্রমণ বাধা দিতে পারিত, কিন্তু হাজিপুরের যুদ্ধের পরে পাঠানদিগের সাহস এবং যুদ্ধ করিবার শক্তি চলিয়া গিয়াছিল, তিরিয়াগলিতে যখন মোগল সৈন্য আসিয়া পঁহুছিল তখন ভয়ে পাঠানদিগের হাত পা ঢুকিয়া গেল। তাহারা যে যেখানে পারিল পলাইয়া গেল, বাঙ্গলা দেশের চাবি কাটি মোগলদিগের হাতে পড়িল। এই খবর পাইয়া সুলতান উড়িষ্যা দেশে পলাইয়া গেলেন, মুনিম খাঁ সৈন্য সামন্ত লইয়া অগ্রসর হইয়া বাঙ্গলার রাজধানী টোণ্ডা দখল করিলেন। আকবর পরাজিত পাঠান সুলতানকে অনুসরণ করিবার জন্য তোডরমলকে পাঠাইলেন, উভয় পক্ষের সৈন্য মেদিনীপুরে সম্মিলিত হইল, কিন্তু টোডরমলের সঙ্গে মোগল সেনাপতির

সহিত মতভেদ হওয়াতে তোডরমল সৈন্য লইয়া বৰ্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিলেন।

দায়ুদ খাঁ কটকে ফিরিয়া গিয়া সেখানে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, তোডরমল এবং মুনিম খাঁর অধীনে সম্মিলিত মোগল সৈন্য কটকের দিকে অগ্রসর হইল, এবং ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে পাঠান এবং মোগল সৈন্যের সংঘর্ষ হইল। যদিও পাঠানগণ প্রাণপণ করিয়া লড়াই করিল কিন্তু সেনাপতি যুদ্ধে আহত হওয়াতে আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাকে যুদ্ধ-ক্ষেত্র ছাড়িতে হইল, এবং পাঠান সৈন্য সেনাপতির অভাবে ছত্রছন্ন হইয়া পড়িল, মোগলগণ যুদ্ধে বিজয়লাভ করিল। দায়ুদ খাঁ অবশেষে সন্ধির জন্য মুনিম খাঁর নিকটে আবেদন করিলেন। মুনিম খাঁ সম্রাটের নামে উড়িষ্যা দেশ দায়ুদ খাঁকে দান করিলেন, কিন্তু বাঙ্গলা দেশ মোগল সম্রাজ্যের সঙ্গে অতঃপর যুক্ত হইল।

মুনিম খাঁ টোণ্ডাতে ফিরিয়া আসিলেন, এবং পরে গৌড়ে আসিয়া তিনি বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ পরিত্যক্ত রাজধানীর অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, তিনি এখন হইতে গৌড়কেই বাঙ্গলার রাজধানী করিবেন স্থির করিলেন। যদিও তখন বর্ষা আরম্ভ হইয়াছিল, তিনি কারিকর এবং মিস্ত্রী আনিয়া গৌড়কে তাহার বিগ্রতশ্রী দান করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু হঠাৎ সৈন্য এবং লোকজনের

মধ্যে মড়ক আরম্ভ হইল, এবং সেই মড়কে বাঙ্গলাবিজেতা মুনিম খাঁও মারা গেলেন। মুনম খাঁর মৃত্যুতে দায়ুদ খাঁ পুনর্ব্বার বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন, তাঁহার অধীনে ৫০,০০০ পাঠান সৈন্য আসিয়া জমা হইয়াছিল, কিন্তু পাঠানসূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়া গিয়াছে, দায়ুদ খাঁ পুনর্ব্বার রাজমহলের যুদ্ধে মোগলের হস্তে পরাজিত এবং বন্দী হইলেন, মোগল সেনাপতি তাঁহার মাথা কাটিয়া সম্রাট আকবরের নিকট আগ্রায় পাঠাইলেন, বাঙ্গলা দেশ এখন হইতে মোগল সাম্রাজ্যের সুবা হইল।

পাঠান রাজত্বে রীতিমত শাসনপ্রণালী ছিল না, জমীদারদিগের উপরে খাজনা আদায়ের ভার ছিল, কিন্তু জরীপ কিংবা জমাবন্দি ছিল না, জমিদাররা নিজের জমিদারিতে স্বাধীন ছিলেন। তাহারা পরস্পরের সঙ্গে নিজেদের ইচ্ছায় সন্ধি কিংবা যুদ্ধ করিতেন, সুলতানকে রাজস্ব দিয়াই তাঁহারা খালাস ছিলেন, রাজস্ব বাকি পড়িলে সুলতান তাঁহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইতেন।

পাঠান সর্দ্দারেরা লেখাপড়ার ধার ধারিতেন না তাঁহারা রাজকার্য্যে কায়স্থ নিযুক্ত করিতেন এবং তাঁহারা রাজাশ্রয়ে বাঙ্গলা দেশে ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিলেন। লোকেরা তখনকার দিনে সাহসী বলবান ও সুস্থ ছিল, ২ টাকা রোজগার করিতে পারিলেই তখনকার দিনে পরিবার প্রতিপালন করা সহজ হইত, সমস্ত জিনিষের দামই অত্যন্ত সস্তা ছিল। পাঠানদিগের সময় রাজবিদ্রোহ এবং

ডাকাতি বীরপুরুষের কার্য্য ছিল, কিন্তু চুরি এবং ঠকামিকে লোকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত।

হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ হইত, যদিও সামাজিকগণ ইহাতে বিশেষ বাধা দিতেন এবং এইরূপ সম্বন্ধকারিদিগকে একঘরে করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কখন কখনও দেখা গিয়াছে যে এইরূপ সম্বন্ধ করিয়া কতকগুলি বংশ সমাজে চলিয়া গিয়াছে।

বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস

পাঠানদিগের বাঙ্গলা দেশ আক্রমণের পূর্ব্বে শূর এবং সেনরাজ বংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এই দেশে বৌদ্ধপ্রাধান্য ছিল, কিন্তু গৌড় রাজগণের ক্ষমতা কমিয়া যাওয়াতে বৌদ্ধধর্ম্মও ক্রমশঃ হতবীর্য্য হইয়া পড়িল, তখন হিন্দু শূর এবং সেনরাজগণ এই দেশে বৈদিক আচার প্রবর্ত্তনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাঙ্গলাদেশে যাহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁহারা যজ্ঞে এবং দেবসেবায় অগ্নিপূজা করিতেন না, তাঁহাদিগকে সেইজন্য নিরগ্নিক বলা হইত, বল্লালসেন কনোজ হইতে সাগ্নিক পঞ্চ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসেন। বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ-গণ নিরগ্নিক হইলেও বিদ্বান শাসনকার্য্যে নিপুণ এবং গুণবান্ বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত বিবাহাদি ক্রিয়া করিতে কনোজ হইতে আগত ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণের কোন আপত্তি ছিল না। পূর্ব্বে বিভিন্ন [illegible]র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিবাহ হইত না,

কিন্তু কনোজ হইতে আগত ব্রাহ্মণগণ তাঁহার মধ্য হইতে বাছিয়া যাহারা সামাজিক আচরণে অধঃপতিত হয় নাই তাহাদের সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিলেন, যাঁহারা শূদ্রের যজন যাজন করিতেন, তাঁহারা উচ্চ সমাজে মিশিতে পারিলেন না। যখন গৌড়ে শূর-দিগের আধিপত্য গেল, তখন তাঁহারা বাঙ্গলার পশ্চিমাংশ রাঢ় দেশে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। কনোজিয়া ব্রাহ্মণরা এখন হইতে রাঢ়ীশ্রেণী হইলেন। রাজারা ইহাদের মধ্য হইতে যাহারা বিদ্বান ও দেবপূজায় অনুরক্ত তাঁহাদিগকে এক একটি গ্রাম দান করিলেন। গ্রামের দেবালয়ে তাঁহাদের ধর্ম্ম চর্চ্চার প্রধান স্থান ছিল, চারিদিক হইতে নিম্নশ্রেণীর লোক আসিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মমত শুনিতেন এবং তাঁহাদের ব্যবস্থা অনুসারে কার্য্য করিত, তাঁহাদের সম্মান কোন রাজার অপেক্ষা কম ছিল না, বৌদ্ধপ্রাধান্য দূর করিয়া বৈদিকাচার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই হিন্দুরাজগণ গ্রামপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

কোন ব্যবস্থাই চিরকাল সুফল প্রসব করে না, বল্লালসেন যখন বাঙ্গলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তখন তিনি দেখিলেন যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে অনাচার প্রবেশ করিয়াছে এবং যাহার জন্য কনোজ হইতে আদিশূর ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, সেই কার্য্যে তাঁহাদের বংশধরগণ শিথিলতা দেখাইতেছিলেন, ইহা দেখিয়া বল্লালসেন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে কুলমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তিনি বাইশটি

কুলপতি ব্রাহ্মণদিগের বংশের মধ্যে আটটিকে মুখ্যকুলীন এবং ১৪টিকে গৌন কুলীন করিলেন। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বল্লালসেনের সময়ে এবং তাঁহার পরেও আদান প্রদান হইত। বল্লালসেনের ব্যবস্থায় অনেক ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যান, কিন্তু লক্ষ্মণসেন সমস্ত কুলীনকে সমান স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন।

কিন্তু পাঠানদিগের আমলে বাঙ্গলাদেশে আবার সামাজিক বন্ধন শিথিল হইতে লাগিল, গৌণকুলীন ও মুখ্যকুলীনের মধ্যে বিভেদ প্রায় ঘুচিয়া যাইবার মতন হইল, দেশে হিন্দু রাজা নাই, সমাজকে কে রক্ষা করিবে? কিন্তু দত্তখাস বলিয়া একজন লোক তখনকার দিনে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, তাঁহার সভায় রাঢ়ীয় সমাজের ব্রাহ্মণগণ আসিয়া ঠিক করিলেন যে ২৫টি দোষ করিলে কুলীনের কুল যাইবে।

দত্তখাস নানাস্থান হইতে প্রধান প্রধান ঘটক আনাইয়া কুল-বিধির সংস্কার করিলেন; দেবীবর এবং সভাস্থিত ঘটকগণ সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন যে অধিকাংশ কুলীনেরই বল্লালের প্রবর্ত্তিত নবগুণ হারাইয়া ফেলিয়াছেন, তিনি দোষ দেখিয়া একপ্রকার দোষাশ্রিত কুলীনকে এক এক দলে রাখিলেন তদনুসারে এক একটি মেল হইল, যদি দোষ দেখিয়া এককালে তিনি কুলমর্য্যাদা উঠাইয়া দিতেন তাহা হইলে সমাজে কুলীনের আদর থাকিত না,

এবং যাহারা সমাজে কুলাচার্য্যের কার্য্য করিতেন তাহাদের সম্মান এবং জীবিকার উপায় চলিয়া যাইত। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ বংশের কুলে বেশী দোষ ঢুকিয়াছিল এবং যাঁহারা দেবীবরের কুলবিধানের পক্ষপাতী হন নাই তাঁহারা "বংশজ" বলিয়া গণ্য হইলেন। যাঁহাদের কৌলীন্যে সামান্য দোষ ঢুকিয়াছিল অথচ কুলীন সমাজে যাঁহাদের প্রতিষ্ঠা যায় নাই, এইরূপ কুলীন সন্তানকে লইয়া দেবীবর "মেল" সৃষ্টি করিলেন। ইহাতে ৩৬টি মেলের সৃষ্টি হইল।

কিন্তু দেবীবরের সংস্কারে সমাজের মঙ্গল হইল না; এখন হইতে কুলানুরাগী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সন্তান পরস্পরের দোষ খুঁজিতে লাগিলেন, কুলাচার্য্যগণের প্রতিপত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা এখন আরও বাড়িয়া গেল, অধিকাংশ লোকই মুসলমান রাজের অনুগ্রহের জন্য লালায়িত ছিলেন; তাঁহারা সমাজের হিতাহিত দেখিতেন না; এই সময়ে গৌরাঙ্গদেবের ভক্তগণ সমাজ হইতে জাতিভেদ প্রথা তুলিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া দেবীবরের ব্যবস্থারও বিশেষ দোষ ছিল, ৩৬টি মেলের মধ্যে বিবাহাদি এবং আদান প্রদান ছিল না, প্রত্যেক মেলের এক একটি পালটি মেলে ছিল, তাহাদের মধ্যেই শুধু আদান প্রদান হইতে পারিত। পরস্পরের মধ্যে রেষারেষিতে দেবীবরের মেল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। "বংশজগণ" সুবিধা পাইয়া অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া মেলের সঙ্গে সামাজিক ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। এই

সময়ে সমাজে ঘটকদিগের পূর্ণ প্রভাব ছিল, তাঁহারা প্রত্যেকটি বংশের সম্বন্ধে খোঁজ রাখিতেন, তাঁহাদের ব্যবস্থা ছাড়া ব্রাহ্মণ সমাজে কোন আদান প্রদান হইতে পারিত না, ঘটককে যাঁহারা সন্তুষ্ট রাখিতে পারিতেন, তাঁহারা নীচ হইলেও ঘটকেরা তাঁহাদের উচ্চ বলিয়া ঘোষণা করিতেন। মেল প্রচলনের পর হইতে ব্রাহ্মণ সমাজে বিবাহ সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ হইল, অনেক মেলে ছেলে অপেক্ষা মেয়েই অধিক জন্মিত। পালটি ঘরে যদি সেই অনুপাতে ছেলে না হইত তাহা হইলে সমস্ত মেয়েদের বিবাহ হওয়া অসম্ভব হইত। এখন হইতে সমাজে :বহু বিবাহ প্রচলন হইল, যাঁহারা নিকষ কুলীন তাহাদের অকুলীনে বিবাহ হইলে কুল যাইত না, এক একজন নিকষ কুলীন বহুসংখ্যক শ্রোত্রিয় কন্যা বিবাহ করিতে লাগিলেন, তাহা ছাড়া আশি বৎসরের বৃদ্ধের সহিত অল্পবয়স্ক বালিকার বিবাহ হইতে লাগিল, অনেক সময়ে পাত্রের অভাবে মেয়েরা ৪০।৫০ পর্য্যন্ত আইবুড় থাকিয়া যাইতেন, এবং অনেক সময়ে এইরূপ প্রৌঢ়ার সহিত বালকের বিবাহ হইত।

মেল সৃষ্টির একশত বৎসর পরে বঙ্গদেশে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের আবির্ভাব হয়; সেই সময়ে বাঙ্গলা দেশে তাঁহার মতন পণ্ডিত লোক কেহই ছিলেন না; মেল প্রচলিত হইবার পর পাত্রের অভাবে যথাকালে কুলীন কন্যার বিবাহ বন্ধ হওয়ায় কুলীন সন্তানগণ বয়স্থা কন্যার বিবাহ অনুমোদন করেন, এবং অনেক কুলীন বহুবিবাহ

লাভজনক ব্যবসা বলিয়া তাহাও সমর্থন করিতে লাগিলেন, কিন্তু বংশজ সমাজে এইরূপ অনাচার প্রবেশ করে নাই, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বংশজ সমাজের মুখপাত্র স্বরূপ এই কুলীনগণের অনাচারী যুক্তি সমূহ খণ্ডন করিলেন। রঘুনন্দন নিয়ম করিলেন, যে বারো বৎসরের উপর মেয়ে যাহার ঘরে থাকিবে, তাঁহাদের জ্ঞাতিবর্গ এবং পূর্ব্বপুরুষ সকলেই নরকে যাইবে।

যে ২৫টি দোষে কুলীন কুল হারাইত দেবীবরের ব্যবস্থায় সে সকল দোষ নামমাত্র দোষ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। রঘুনন্দন সেই দোষ ধর্ম্মহানিকর বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

এখন হইতে ব্রাহ্মণ সমাজে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর আসক্তি হইতে লাগিল, কুলীনগণ সাবধান হইয়া আবার নিজেদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে চলিতে লাগিলেন।

বৈদ্য ও কায়স্থ সমাজও এখন লইতে বাঁধাবাঁধি নিয়মে চলিতে লাগিল।

এক সময়ে বাঙ্গলা দেশে সুবর্ণ বণিকদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, তাঁহারা বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেন, বৈদ্যরাও বৈশ্য ছিল সেইজন্য এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে রেষারেষি ছিল। মহারাজ বল্লালের বৈদ্যদের উপরে বিশেষ সহানুভূতি ছিল, তাঁহার সময়ে সুবর্ণ বণিক-দের পতন হয়।

৺দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয়ের বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসে

এই সুবর্ণবণিকদের পতন সম্বন্ধে একটি কৌতুকপ্রদ গল্প আছে, সে গল্পটি তাঁহার পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া তোমাদিগকে দিতেছি।

"কুন্দন আচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণের বাটীতে অর্দ্ধরাত্রকালে এক ব্রাহ্মণ অতিথি উপস্থিত হইল।

কুন্দন বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁহার পত্নীর হাতে কোন টাকাকড়ি ছিল না। এত রাত্রিতে ধারে দ্রব্য পাওয়া যায় না অথচ অতিথি সেবা না করিলে অধর্ম্ম হয়। দ্বিজপত্নী এই সঙ্কটে পড়িয়া রাজদত্ত স্বুবর্ণধেণু গচ্ছিত রাখিয়া মণিদত্ত নামক সুবর্ণবণিকের দোকান হইতে পঞ্চবুটিকা (এক পয়সা) মূল্যের দ্রব্য আনিয়া অতিথির ভোজন করাইলেন। পরদিন কুন্দন গৃহে আসিয়া পত্নীর নিকট বৃত্তান্ত শুনিলেন এবং মণিদত্তের নিকটে গিয়া দ্রব্যমূল্য লইয়া স্বর্ণগাভী প্রত্যর্পণ করিতে বলিলেন, মণিদত্ত দুর্লোভের বশীভূত হইয়া সমস্ত ঘটনাই অস্বীকার করিলেন।

কুন্দন নগরপালকে সংবাদ দিলেন। এদিকে মনিদত্ত সুগর্ণগাভী ভাঙ্গিয়া একটি ঢেঁপা তৈয়ারী করিল। নগর পাল সেই ঢেঁপার ওজন ঠিক ১০৮ তোলা দেখিয়া সন্দিহান হইল এবং ঢেঁপা সহ বণিক্‌কে বিচারার্থ চালান করিল।

বল্লাল স্বয়ং সেই মোকদ্দমায় বিচার করিতে বসিলেন। এই উপলক্ষে সমস্ত সুবর্ণবণিকদিগকে পাতিত করা তাঁহার মনস্থ ছিল। মণিদত্ত বল্লভানন্দের ভাগিনেয়, সম্রাট তাঁহা জানিতেন এজন্ত তিনি

বল্লভানন্দ শেঠকে ডাকিয়া ঐ সোনার গোলাতে অন্ত কিছু মিশ্রিত আছে কিনা তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। বল্লভ ভাগিনার স্নেহে মিথ্যা বলিলেন। বল্লাল তখন অন্যান্য সুবর্ণবণিকদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারা সকলেই তাহাদের দলপতি বল্লভানন্দের উক্তি সমর্থন করিল। তাহার পর বল্লাল গন্ধবণিক ও শঙ্খবণিক-দের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা বলিল "আমরা সুবর্ণ পরীক্ষায় বিশেষ পটু নহি, মহারাজ, স্বর্ণকারদিগকে জিজ্ঞাসা করুণ।"

সম্রাট স্বর্ণকারদিগকে তলপ করিলেন। বল্লভানন্দ নিজের মিথ্যায় .ধরা পড়িবে বুঝিয়া উৎকোচ দ্বারা স্বর্ণকারদিগকে বশীভূত করিলেন। তাহারাও শেঠের উক্তিই পোষণ করিলেন কুন্দন সেই স্বর্ণগোলা নিজ স্বর্ণগাভীর বিকৃতি বলিয়া জিদ্ করিতে লাগিলেন বল্লাল কাশীধাম হইতে স্বর্ণকার আনাইলেন, তাহাদিগকে এরূপ সাবধানে পরিবেষ্টিত রাখিলেন তাহাদের সহ কেহ কোন ঘুষের চুক্তি করিতে পারিল না, সেই স্বর্ণকারেরা অষ্টধাতু ও অলকক্তক মিশ্রিত স্বর্ণ উক্ত ঢেঁপাতে প্রমাণ করিল। বল্লাল সেই বিদেশীয় স্বর্ণকার দিগকে পুরস্কার দিয়া বিদায় দিলেন তাহার পর স্বর্ণকার ও সুবর্ণ-বণিকদিগকে পতিত করিয়া কহিলেন "অদ্যাবধি এই সুবর্ণকীটের বিষ্ঠার কৃমি অপেক্ষাও অপকৃষ্ট গণ্য হইবে, তাহাদের সমস্ত অর্থ নিঃসাৎ অর্থাৎ জব্দ হইল।" সুবর্ণবণিকদিগের সামাজিক

অবনতির পর হইতে তিলী শুঁড়ী প্রভৃতি জাতিগণ বাণিজ্যের দ্বারা সমৃদ্ধশালী হইতে লাগিল।

বাঙ্গলাদেশের সমাজ রঘুনন্দনের স্মৃতির শৃঙ্খল পরিল, যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা ভারতবাসীর আদর্শ হয়, তাহা হইলে রঘুনন্দনের ব্যবস্থাকে উৎকৃষ্ট বলিতে হইবে। কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম শুধু একটা সামাজিক ব্যবস্থা, কোন সময়ে ইহার প্রয়োজন থাকিতে পারে, কখনও বা নাও থাকিতে পারে যে সকল নিয়মের দ্বারা অধিকাংশ লোকেয় মঙ্গল হয় তাহাকে ভাল বলা যাইতে পারে; যুগে যুগে কখনও একই প্রকারের বিধিব্যবস্থা সুফল প্রসূ হয় না, বল্লালসেন হইতে আরম্ভ করিয়া রঘুনন্দন পর্য্যন্ত সকলই মানুষের জন্মগত অধিকার এবং দায়িত্ব স্বীকার করিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অস্বীকার করিলেন, মানুষ অতিমাত্র কষাকষির মধ্যে পড়িয়া নির্জ্জীব হইয়া পড়িল বাহিরের আক্রমণ এবং বিদেশীর হাতে পরাজয় ইহা রোগের চিহ্ন মাত্র আমাদের দেশের ভিতরের রোগ সামাজিক। যেখানে কতকগুলি সংকীর্ণবুদ্ধি শাস্ত্রকার মানুষের চারিদিকে গণ্ডী টানিয়া তাহার চলাকে অচল করিয়া রাখিয়াছে। বাতব্যাধি রোগীর যদি ক্ষততে মশা বসে তাহা হইলে মশা তাড়ানই তাহার চিকিৎসা নহে, তাহার প্রকৃত চিকিৎসা বাতকে সারান। কেহ কেহ বলেন যে মুসলমান আক্রমণে আমাদের সমাজকে রক্ষা করিবার ইহা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না, আমাদের ভগবান ক্রিশ্চিয়ান এবং

মুসলমানের ভগবানের মতন যদি সর্ব্ব সাধারণের ভগবান হইত তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণের ভক্তির দ্বারা সুরক্ষিত হইতে পারিত।

কিন্তু "বজ্র আঁটনি ফস্কা গিরো" ; রঘুনন্দনের সময়ে নবদ্বীপে এক জন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল যিনি বলিতেন "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণ"। তাঁহার কাছে জাতিভেদ ছিল না, হিন্দু মুসলমান তাঁহার কাছে সমান ছিল, তিনি হরিভক্ত দ্বারা সমস্ত দেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সংস্কারক ছিলেন। তাহার যখন জন্ম হয় তখন নবদ্বীপ বাঙ্গলার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ছিল, সমস্ত ভারত-বর্ষ হইতে এখানে বিদ্যা শিক্ষার জন্য ছাত্র আসিত।

১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপের পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে চৈতন্যের জন্ম হয়। তাঁহার মা শচীদেবী অতি শান্ত শিষ্ট মানুষ ছিলেন। চৈতন্যের নাম ছিল নিমাই, বেশী বয়স পর্য্যন্ত জগন্নাথ মিশ্র তাঁহার একমাত্র পুত্রটিকে লেখা পড়া শিখিতে দেন নাই, অল্প বয়সে নিমাই অত্যন্ত দুরন্ত ছিল, তাঁহার অত্যাচারে পাড়ার সকলে ভয় পাইত। যখন তাঁহার বাপ মা এই অশান্ত বালকটিকে কিছুতেই শিষ্ট করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা ইহাকে একজন পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পড়িতে পাঠাইলেন; ব্যাকণের মতন নীরস বিষয়ে নিমাই অদ্ভুত প্রতিভা দেখাইতে লাগিলেন, অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার খ্যাতি দেশ বিদেশে

ছড়াইয়া পড়িল। ব্যাকরণ পড়া সাঙ্গ করিয়া যখন নিমাই পণ্ডিত টোল খুলিলেন, তখন তাঁহার টোলে ছাত্রের অভাব হইল না, দেশ বিদেশ হইতে তাঁহার কাছে পড়িবার জন্য ছাত্র আসিতে লাগিল। এই সময়ে কেশব কাশ্মীর বলিয়া একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তর্ক-যুদ্ধে নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলকে হারাইয়া দিবার জন্য আসিলেন। নিমাই তর্কযুদ্ধে পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য অভিমান ঘুচাইয়া দিলেন, তিনি নিকটস্থিত গঙ্গার উদ্দেশ্যে কবিতা রচনা করিলেন, সকলে সেই কবিতা শুনিয়া বাহবা দিতে লাগিল। কিন্তু নিমাই পণ্ডিত সেই কবিতায় ব্যাকরণের এবং অলঙ্কারের দোষ বাহির করিয়া দেখাইলেন, পণ্ডিত তখন সুর্ সুর্ করিয়া পলাইয়া গেলেন। ইহার পর নিমাই নবদ্বীপের গৌরব স্থল হইলেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গে বেড়াইতে গেলেন, সেখান হইতে ফিরিয়া শুনিলেন যে তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। নিমাইএর মনে খুব আঘাত লাগিল, তাঁহার, মা শচীদেবী তাঁহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত আবার বিবাহ দিলেন এই ঘটনার বহু-দিন আগে জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যু হইয়াছিল। স্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁহার মনে প্রথম বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহার পর গয়ায় তিনি তাঁহার পিতার পিণ্ড দান করিতে গিয়া ঈশ্বরপুরী নামক একজন শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী দেখিয়া তাঁহার মনে ভগবদ্‌চিন্তা জাগিয়া উঠিল। তার পর গয়ায় বিষ্ণুপদে পিণ্ড দিতে গিয়া তাঁহার মনে অভূতপূর্ব্ব ভাবাবেশ হয়,

তিনি সেখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার বন্ধু বান্ধবগণ অতি-কষ্টে তাঁহাকে নবদ্বীপে ফিরাইয়া আনিলেন, কিন্তু গৃহের বাঁধন তাঁহার খুলিয়া গিয়াছে। তিনি কাটোয়ায় কেশবভারতীর নিকটে দীক্ষা লইয়া ২৪ বৎসর বয়সে সংসার ছাড়িলেন।

এই সময় নিত্যানন্দ বলিয়া একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন, ইঁহারা দুইজনে মিলিয়া সংকীর্ত্তনের দল গড়িলেন সমস্ত নবদ্বীপ সহর তাঁহারা হরিনামে মাতাইলেন, নিমাই জাতিবিচার মানিতেন না, গঙ্গায় যাঁহারা স্নান করিতে যাইতেন তিনি চাকরের মতন তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতেন। নবদ্বীপের ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ মণ্ডলী নিমাইয়ের আচরণ দেখিয়া ভাবিলেন যে আর জাতিধর্ম্ম রহিল না, সংকীর্ত্তণের গোলমাল তাহাদিগের ভাল লাগিত না, তাঁহারা কাজীর কাছে গিয়া নালিশ করিলেন যে সংকীর্ত্তন না বন্ধ হইলে তাঁহারা আর নবদ্বীপে থাকিতে পারিবেন না, সেদিন নিমাই সংকীর্ত্তনের প্রকাণ্ড দল করিয়া কাজীর বাড়ীর সম্মুখেই ঢাক ঢোল বাজাইয়া হরি নাম করিতে লাগিলেন, কাজী ঘরের বাহির হইয়া ভাবোন্মত্ত চৈতন্যদেবকে দেখিয়া তাঁহার মুখে হরিনামের অপরূপ মহিমা শুনিয়া চৈতন্যদেবকে কিছু বলিলেন না।

জগাই মাধাই দুইজন পাষণ্ড মাতাল সহরের কোতয়াল ছিল; সংকীর্ত্তণ করিয়া যখন একদিন নিমাই ও নিত্যানন্দ বাড়ী ফিরিতে ছিলেন, তখন এই দুইটি পাষণ্ড একটি ভাঙ্গা পিতলের কলসী

নিত্যানন্দকে লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া মারিলেন নিত্যানন্দের কপাল দিয়া দর্ দর্ করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, কিন্তু যিনি কৃষ্ণকে আপনার করিয়াছেন তাঁহার রাগ কোথায়? নিতাই দৌড়াইয়া গিয়া জগাই মাধাইকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "মেরেছ মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দেবনা" এই প্রেমের আতিশয্যে জগাই মাধাইএর পাপ ধুইয়া গেল, তাহার পর হইতে তাহাদের চরিত্র একবারে শুধরাইয়া গেল।

সন্ন্যাস ধর্ম্ম লইয়া ১৫০৯ খৃঃ অব্দে চৈতন্যদেব দেশ ছাড়িলেন তিনি প্রথমে উড়িষ্যায় পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে আসিলেন। তখনকার দিন সেখানকার রাজা প্রতাপরুদ্র ছিলেন তিনি পাঠানদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন কিন্তু চৈতন্যদেবের মতন সাধু-ধার্ম্মিককে পাইয়া তিনি কৃতার্থ হইলেন, তিনি তাঁহার শিষ্য হইলেন। ইহার পর চৈতন্যদেব সমস্ত দক্ষিণ দেশ ঘুরিয়া বেড়াইলেন যেখানে তিনি গেলেন সেখানে তাঁহার অপরূপ ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া দলে দলে লোক তাঁহার শিষ্য হইল, বিখ্যাত দস্যু নওরোজী তাহার ব্যবসা ছাড়িয়া চৈতন্যদেবের শিষ্য হইয়া তাঁহার সঙ্গ লইলেন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সাঙ্গ করিয়া চৈতন্যদেব ১৫১১ খৃষ্টাব্দে পুরীতে ফিরিয়া আসিলেন, তাহার পর তিনি কৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবনে গিয়া ৬ বৎসর কাটাইয়া পুরীতে আসিয়া ১৫৩৪ খৃঃ অব্দে দেহত্যাগ করেন।

হরিদাস তাঁহার প্রধান মুসলমান শিষ্য ছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মে জাতিবিচার ছিল না। গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী তখনকার দিনে একজন প্রধান ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি নরোত্তম বলিয়া চৈতন্যের একজন শূদ্র শিষ্যের পদধূলি লইয়া তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেন। মৃত হিন্দুসমাজে প্রাণের স্পন্দন দেখা গেল; দেশের মধ্যে বিখ্যাত ব্যক্তিরা পর্য্যন্ত চৈতন্যের সংস্পর্শে আসিয়া সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন।—এমন করিয়া হিন্দুসমাজের কষাকষির মধ্যে থাকিয়াও মানুষ পুনরায় নূতন জীবনের আস্বাদ পাইল।

কালাপাহাড়

(১)

সমাজের সংকীর্ণতার জন্য কেমন করিয়া সমাজের যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা হিতৈষী তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে একজনের গল্প এখানে তোমাদিগকে বলিব।

একজনের নাম ছিল কালাচাঁদ রায়; তিনি একটা কিন্নার ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং শিক্ষা দীক্ষায় পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তিনি পারশী বেশ ভাল জানিতেন, দখিতেও তিনি খুব সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার দুই বিবাহ ছিল, বিবাহের পরে চাকুরীর জন্য তিনি গৌড়ে আসিলেন, সেখানে গৌড়ের সুলতান তাঁহাকে ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করিলেন, তাঁহার বাসা সম্রাটের রাজপ্রাসাদের অতি নিকটেই ছিল।

একদিন সুলতান কন্যা দুলারী বিবি এই সুপুরুষ যুবককে দেখিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িলেন, তিনি ঠিক করিলেন যে কালাচাঁদ রায় ছাড়া তিনি আর কাহাকেও বিবাহ করিবেন না।

এই কথা বেগম সাহেবার কানে গেল, তিনি সুলতানকে বলিলেন; সুলতানও এই সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত তাঁহার পরমরূপসী কন্যা বিবাহ খুব ভাল হয় বলিয়া মনে করিয়া কালাচাঁদকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, কিন্তু কালাচাঁদ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দু; তিনি মুসলমান রমণীকে বিবাহ করিতে কিছুতেই রাজি হইলেন না; সুলতান ইহাতে অত্যন্ত চটিয়া গিয়া জল্লাদকে হুকুম দিলেন "ইহাকে শূলে চড়াও"। তাহার হুকুমমত জল্লাদ কালাচাঁদকে হাত পা বাঁধিয়া বধ্যভূমিতে লইয়া গেল। ইতিমধ্যে দুলারী বিবির কাছে এই খবর গেল। তিনি পাগলিনীর মতন বধ্যভূমিতে ছুটিয়া আসিয়া জল্লাদকে বলিলেন "আমাকে না মারিয়া ইঁহাকে তোমরা কিছুতেই মারিতে পারিবে না।" কালাচাঁদ দুলারীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইলেন। সুলতান অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাহার কন্যার সহিত কালাচাঁদের বিবাহ দিলেন।

এখনও কালাচাঁদ হিন্দু, কিন্তু সমাজ এই বিবাহের পর কালাচাঁদকে পরিত্যাগ করিল, তাহার জাতি গেল তাহার অপর দু'টী স্ত্রী তাহার মুখ দেখা ছাড়িয়া দিল। কালাচাঁদের সমাজের উপর ভীষণ আক্রোশ হইল। এখন হইতে কি করিয়া হিন্দুধর্ম্মকে অনিষ্ট করিতে পারেন, তাহাই তাহার দিবারাত্রের চিন্তার বিষয় হইল কালাচাঁদ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা লইয়া মহম্মদ ফার্ম্মুলি নাম

নিলেন। তাঁহার অত্যাচারের জন্য হিন্দুরা তাহাকে "কালাপাহাড়" বলিত। তিনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ভগবানের প্রত্যাদেশ পাইবার জন্য উড়িষ্যা দেশের জগন্নাথের মন্দিরে সাতদিন ধন্না দিয়াছিলেন, কিন্তু ধন্নায় কোন ফল হল না উপরন্তু পাণ্ডারা তাহার পরিচয় পাইয়া অপমান করিয়া মন্দির হইতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন।

সুলতানের কাছে অনুমতি লইয়া তিনি জগন্নাথের মন্দির ধ্বংশ করিবার জন্য সৈন্য সামন্ত লইয়া উৎকলে গেলেন, কালাপাহাড় উৎকলের প্রবল পরাক্রান্ত রাজাকে যুদ্ধে হারাইয়া দিয়া এই হিন্দু-রাজ্য মুসলমান সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। তিনি শ্রীক্ষেত্রে যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহার তুলনা নাই। কালাপাহাড় হিন্দুর মন্দির ভাঙ্গিয়া চুরিয়া চুরমার করেন। এবং যেরূপ উৎপীড়ন হিন্দুদের উপর করেন তাহাতে অনেকেরই মৃত্যু হয়। কামরূপ হিন্দুরাজ্য ছিল, তিনি কামরূপের কিয়দংশ জয় করিয়া সেখানকার লোকদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার করেন। কত দেব-দেবীর মন্দির যে তিনি নষ্ট করেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট বেলোল লোদীর সহিত জৌনপুরের সুলতানের সহিত বহুবৎসর ধরিয়া লড়াই চলিতেছিল। জৌনপুরের সুলতান গৌড়ের সুলতানকে লিখিয়া পাঠাইলেন "আপনি আমার রাজ্য রক্ষার জন্য কালাপাহাড়কে পাঠাইয়া দিন।" কালাপাহাড়

ভাবিলেন এই সুযোগে সেখানে গিয়া প্রয়াগ কাশী অযোধ্যা প্রভৃতি হিন্দুদিগের তীর্থস্থান ধ্বংশ করিতে হইবে, সেইজন্য অত্যন্ত আনন্দের সহিত তিনি কয়েকটি অশ্বারোহী লইয়া জৌনপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। ইতিমধ্যে বেলোল লোদী ভাবিলেন যে কালাপাহাড়ের মতন যোদ্ধা যদি শত্রুপক্ষে যোগ দেয় তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে। সেইজন্য তিনি কৌশলে পথে কালাপাহাড়কে বন্দী করিয়া তাঁহাকে দিল্লীতে আনাইলেন। দুই বৎসর ধরিয়া নানাপ্রকার তোষামোদ করিয়া তিনি তাঁহাকে বশীভূত করিয়া তাঁহার অধীনে সৈন্য সামন্ত দিয়া জৌনপুরের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। এবার জৌনপুরের সুলতান সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। সমগ্র হিন্দুস্থান কালা-পাহাড়ের বীরত্বে এবং শৌর্য্যে চমৎকৃত হইল।

জৌনপুরের রাজ্যে কাশীধাম ছিল হিন্দুদিগের সর্ব্বাপেক্ষা বড় তীর্থ, কালাপাহাড় সৈন্য লইয়া কাশীতে যেরূপ অত্যাচার করিলেন তাহার তুলনা নাই, কেবল একটিমাত্র দেবমন্দির ছাড়া অপর সমস্ত দেবমন্দির তাঁহার আদেশে ধ্বংশ করা হইল।

কাশীতে কালাপাহাড় নিরুদ্দেশ হন, কেহ কেহ বলেন গোপনে কাশীর পাণ্ডারা তাহাকে ঘুমন্ত অবস্থায় চুরি করিয়া লইয়া জীবন্ত মাটিতে পুতিয়া ফেলেন।

বঙ্গে পাঠান ও মোগল

দায়ুদ খাঁর মৃত্যুর পর বাঙ্গলার মসনদ খালি ছিল না, বাদসাহ আকবরের শাসনকর্ত্তারা তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ বাঙ্গলা শাসন করিতে লাগিলেন, কিন্তু এখনও পাঠানদিগের আশাভরসা নির্ম্মূল হয় নাই। মোগলকর্ম্মচারিদিগের অত্যাচার তাহাদের অসহ্য হওয়াতে বারবার তাহারা সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইল। তখনও বাঙ্গলায় অনেক বড় বড় পাঠান জায়গীরদার ছিলেন। কাকেসেলান বলিয়া একটি পাঠান বংশ তখন পাঠানদিগের মধ্যে প্রতিপত্তিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। আকবর যখন তাঁহার খাজনা আদায়ের নূতন পদ্ধতি বাঙ্গলাদেশে প্রচলিত করিলেন তখন পাঠান জমিদারগণ তাহা জুলুম বলিয়া মনে করিলেন, চারিদিকে পাঠানদিগের মধ্যে যুদ্ধসাজের ধূম পড়িয়া গেল। বিহারের পাঠানগণ মাসুম কাবুলির অধীনে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া, তেলিয়াগলির পার্ব্বত্যপথ অধিকার করিয়া বাঙ্গলার পাঠান বিহারের বিদ্রোহীদের সহিত একজোট হইল। তাহার পরে তোণ্ডা দখল করিয়া তাঁহার মোগল শাসনকর্ত্তাকে হত্যা করিয়া সৈয়দুদ্দিন হোসেন নামক একজন পাঠানকে তাঁহাদের সেনাপতি নির্ব্বাচিত করিলেন। বাঙ্গলা পুনরায় পাঠানদিগের হাতে আসিল।

যখন আকবরের নিকটে এই বিদ্রোহের কথা পোঁছিল তখন তিনি রাজা তোডরমল্লকে বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য বাঙ্গলায় পাঠাইলেন। রাজা তোডরমলের অধীনে যে মোগল সৈন্য ছিল, তাহা দিয়া বাঙ্গলাদেশে পাঠান বিদ্রোহ দমন করা যায় না, কিন্তু তাঁহার অধীনে যে রাজপুত সৈন্য ছিল, তাহারা এক দিকে যেমন বিশ্বাসী অপর দিকে তাহারা যুদ্ধ করিতেও তেমন পটু ছিল।

তোডরমল নিরাপদে মুঙ্গেরে আসিয়া পোঁছিলেন এখানে পৌঁছিয়া তিনি নিজের সৈন্যাবাসকে নানাপ্রকার উপায়ে সুরক্ষিত করিলেন, তাঁহর অদূরে ৩২ মাইল দূরে ভাগলপুরে ৩০ হাজার পাঠান সৈন্য সমবেত হইয়াছিল, তোডরমল্ল নিকটবর্ত্তী হিন্দু জমিদারদিগকে বলিয়া কহিয়া পাঠান সৈন্যদিগের রসদ বন্ধ করিয়া দিলেন। রসদ ফুরাইয়া যাওয়াতে পাঠানেরা খুব মুস্কিলে পড়িল, বাধ্য হইয়া তাহাদের ভাগলপুর ত্যাগ করিতে হইল। মাসুম কাবুলি বিহারে ফিরিয়া আসিলেন। কাকেসেলানদিগের দলপতি তোণ্ডার দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং আর একজন দলনায়ক ঘুরিয়া পাটনা অধিকার করিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু তোডরমল খবর পাইয়া পাটনা সুরক্ষিত করিলেন। পাটনার যুদ্ধে পাঠানগণ হারিয়া গেল। এই সামান্য যুদ্ধের পর বিহার তোডরমলের হাতে আসিল।

বিহার অধিকারের পর আকবর খাঁ আজিম নামক একজন সম্ভ্রান্ত মোগলকে বাঙ্গলা উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন, ইনি ছলে বলে ও কৌশলে কাকেসেলানদিগের পরস্পরের মধ্যে ঘরোয়া বিবাদ ঘটাইয়া দিয়া নির্ব্বিঘ্নে তোণ্ডা অধিকার করিলেন।

এদিকে পাঠানগণ বাঙ্গলা হারাইয়া উড়িষ্যায় আসিয়া তাঁহাদের বল বিক্রম বাড়াইতে লাগিল, তখন পাঠানদিগের সর্দ্দার ছিলেন কতলু খাঁ; উড়িষ্যা দখল করিবার পর মেদিনীপুর এবং বিষ্ণুপুর তিনি জয় করিলেন। খাঁ আজিম অনতি বিলম্বে আফগানদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য সৈন্য দিয়া একজন মোগল কর্ম্মচারীকে পাঠাইলেন। মোগল কর্ম্মচারী দেখিলেন যে পাঠানদিগের যে সৈন্যবল তাহাতে তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা তাঁহার পোষাইবে না, তাঁহাদের সঙ্গে সন্ধি করিবার জন্য ফরিদ আবদীন বোখারি বলিয়া একজন বিখ্যাত সেনাপতি এবং লেখককে পাঠাইলেন। সঙ্গে তাঁহার তিনশত অশ্বারোহী যোদ্ধা ছিল। বর্দ্ধমানের সন্নিকটে কতলু খাঁর সহিত মোগল সম্রাটদূতদিগের দেখা হইল। তিনি দুর্গে আসিয়া ইঁহাদের সম্মানের জন্য একটি বিরাট ভোজের আয়োজন করিলেন। ভোজের পূর্ব্বে কতলু খাঁ তাঁহার সেনাপতি বাহাদুর খাঁর সহিত ফরিদের পরিচয় করিয়া দিলেন, বাহাদুর খাঁ সৈয়দবংশের লোক, মহম্মদের বংশধর বলিয়া তাঁহার

আত্মাভিমান ছিল। তিনি ভাবিলেন যে ফরিদ্ তাঁহাকে অবহেলা করিয়াছেন। পাঠানগণ অতিশয় প্রতিহিংসা পরায়ণ ছিল, বাহাদুর খাঁ ঠিক করিলেন, ভোজের পর তিনি সম্রাটদূতের উপরে প্রতিশোধ লইবেন ; ভোজের সময়ে ফরিদের কানে যখন এই সংবাদটি গেল তখন ভোজ শেষ হওয়া মাত্র শরীর খারাপ বলিয়া কতলু খাঁর কাছে বিদায় লইয়া নিজের শিবিরে প্রবেশ করিলেন কতলু খাঁ তাঁহার সেনাপতির ষড়যন্ত্রের কথা জানিতেন না, এবং জানিলেও কখনও তিনি ইহাতে সায় দিতেন না। যখন মোগলগণ তাঁহাদের শিবিরে আশ্রয় লইলেন তখন বাহাদুর খাঁ তাঁহার সৈন্য লইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই হত হইলেন। ফরিদ কিন্তু নির্বিঘ্নে তাঁহার সেনাপতির কাছে পঁহুছিলেন। এই বিশ্বাসঘাতকতায় পাঠানদিগের প্রতিপত্তি অনেকটা কমিয়া গেল মোগলগণও প্রবলবেগে কতলুকে আক্রমণ করিল। অবশেষে বাধ্য হইয়া পাঠান সর্দ্দার কতলুকে জঙ্গলে গিয়া আশ্রয় করিতে হইল।

খাঁ আজিম বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তার পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন এবং সাহ্‌বাজ খাঁ বলিয়া আর একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমান তাঁহার পদে নিযুক্ত হইলেন ; পাঠানদিগের ক্ষমতা তখনও প্রবল ছিল বলিয়া সাহ্‌বাজ খাঁ কতলুখাঁর সঙ্গে সন্ধি করিলেন,

উড়িষ্যা দেশকে তিনি কতলু খাঁ এবং তাঁহার পাঠান অনুচরদিগের হাতে ছাড়িয়া দিলেন।

সম্রাট আকবর এইরূপ সন্ধিতে খুসী হইলেন না; তিনি সাহবাজ খাঁর হাত হইতে বাঙ্গলার শাসনভার ফিরিয়া লইয়া উজীর খাঁর হাতে দিলেন। উজীর খাঁ বাঙ্গলা দেশে আসিয়া মারা গেলেন। সম্রাট তখন বাঙ্গলা এবং বিহারের শাসনভার রাজা মানসিংহের হাতে দিলেন।

বাঙ্গলাদেশ অস্বাস্থ্যকর বলিয়া মানসিংহ ঠিক করিলেন যে তিনি বিহারে থাকিবেন, প্রতিনিধি দিয়া বাঙ্গলাদেশ শাসন করিবেন। বিহারের প্রবেশ পথে রোটাস দুর্গকে তিনি মেরামত করাইলেন এবং রাজমহলে তিনি বাঙ্গলা এবং বিহারের রাজধানী নির্ম্মাণ করিলেন। সম্রাটের নামে রাজমহলের নাম আকবরনগর হইল।

মানসিংহের প্রধান কাজ উড়িষ্যা দেশ আফগানদিগের হাত হইতে উদ্ধার করা; তিনি সৈন্য সামন্ত লইয়া ভাগলপুর হইতে বাঙ্গলাদেশের দিকে রওনা হইলেন, এবং তাঁহার বাঙ্গলার মুসলমান প্রতিনিধি সৈয়দ খাঁকে বর্দ্ধমানে বাঙ্গলার সৈন্য লইয়া মিলিত হইবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। বর্দ্ধমানে আসিয়া খবর পাইলেন যে সৈয়দ খাঁ তাঁহার সৈন্য লইয়া প্রস্তুত হইতে পারেন নাই; সেই জন্য তিনি রাজা মানসিংহের সঙ্গে যোগ দিতে

পারিলেন না ; তাহা ছাড়া বর্ষা আসিতেছে, এ সময়ে উড়িষ্যা দেশ আক্রমণ করা তাঁহার মতে যুক্তিসঙ্গত নহে। রাজা মানসিংহ অগত্যা বর্ত্তমান কলিকাতার নিকটে জাহানাবাদে শিবির সংস্থাপন করিলেন, এদিকে কতলু খাঁর সাহস বাড়িয়া গেল। তিনি বাঙ্গলাদেশে আসিয়া চারিদিকে লুটপাট করিতে লাগিলেন ; মানসিংহ তাঁহার পুত্র জগৎসিংহকে পাঠান আক্রমণ বাধা দিবার জন্য পাঠাইলেন, জগৎসিংহ কিন্তু অকস্মাৎ পাঠানদিগের হাতে বন্দী হইলেন। এই সময়ের ঘটনা বঙ্কিমচন্দ্র "দুর্গেশনন্দিনী"তে বর্ণনা করিয়াছেন।

কিন্তু মোগলদিগের ভাগ্য ছিল ভাল। কতলু খাঁ নাবালক রাখিয়া এই সময়ে মারা গেলেন। কতলুর মন্ত্রী খাজা ইসা মানসিংহের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। জগৎসিংহ মুক্ত হইলেন, পাঠানগণ মোগলদিগের অধীনে থাকিয়া উড়িষ্যাদেশ শাসন করিবার ভার পাইলেন, সম্রাটের নামে টাকা মুদ্রিত করিতে অঙ্গীকার করিলেন হিন্দুদিগের পবিত্র জগন্নাথের মন্দির তাঁহারা মানসিংহকে দান করিলেন, এবং অবশেষে একশত পঞ্চাশটি হাতী এবং বহুসংখ্যক মূল্যবান জিনিষ সম্রাটকে উপহার দিয়া সন্ধি পাকা করিয়া লইলেন। যতদিন খাজা ইসা জীবিত ছিলেন ততদিন মোগলগণ উড়িষ্যা দেশ আক্রমণ করে নাই।

১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আকবর দাক্ষিণাত্য জয় করিবার সঙ্কল্প করিলেন, তিনি মানসিংহকে তাঁহার সৈন্য লইয়া তাঁহাকে যোগ দিবার জন্য আদেশ করিলেন। মানসিংহের অনুপস্থিতিতে আবার বাঙ্গলা দেশে পাঠানগণ প্রবল হইয়া উঠিল। কতলুখাঁর ছেলে ওসমান খাঁ সাবালক হওয়াতে পাঠানগণ দলে দলে তাঁহার সৈন্যদলভুক্ত হইতে লাগিল। মানসিংহ মোহন সিংহ এবং প্রতাপ সিংহ বলিয়া দুইজন রাজপুতকে বাঙ্গলা এবং বিহারের শাসনভার দিয়া গিয়াছিলেন, পাঠানগণ অনায়াসে ইঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের লুপ্তরাজ্য পুনরায় অধিকার করিল। সম্রাট্ এই খবর পাইয়া পুনরায় মানসিংহকে বাঙ্গলা দেশে পাঠাইলেন। মানসিংহ রোটাসে কিছুকাল অপেক্ষা করিলেন, পরাজিত মোগলসৈন্য আসিয়া তাঁহার দল পুষ্ট করিল। ইহার পরে সেরপুর-অত্যয়ে পাঠানদিগের সহিত মোগলদিগের একটি ভীষণ যুদ্ধ হইল, পূর্ব্বের যুদ্ধেতে পাঠানগণ মীর আবদল রেজাক্ বলিয়া মোগল সৈন্যের খাজাঞ্চীকে বন্দী করিয়া এই যুদ্ধের আরম্ভে তাঁহার হাত পা বাঁধিয়া তাঁহাকে একটি হাতীর উপরে চড়াইয়া দিয়া পাশে একজন আফগানকে বসাইয়া দিয়াছিল, এই আফগানটির উপরে আদেশ ছিল যে যুদ্ধে যদি পাঠানগণ পরাজিত হয় তাহা হইলে যেন বিজয়ী মোগল সৈন্যদিগের সামনেই তাঁহার বুকে ছোরা বসাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বন্দুকের গুলিতে পাঠানটিই নিহত হইল, মোগল

সৈন্য অমিতবিক্রমে অগ্রসর হইয়া হাতী হইতে রেজাক্‌কে উদ্ধার করিয়া তাঁহার হাত পায়ের শিকল কাটিয়া দিল। পাঠানগণ পরাজিত হইয়া পুনরায় উড়িষ্যা দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পাঠানগণ ইহার পরে একেবারে হতবীর্য্য হয়ে পড়ে নাই, সায়েস্তা খাঁর সময়ে ইহারা আর একবার বিদ্রোহী হইয়া পরাজিত হয়। বাঙ্গলায় পাঠান মোগলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা মুসলমান আমলের শেষ পর্য্যন্ত ছিল।

বঙ্গে মোগল মগ ও ফিরিঙ্গি।

১৬০৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর ইস্‌লাম খাঁকে বাঙ্গলার শাসন-কর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন।

ইস্‌লাম খাঁ রাজমহল হইতে বাঙ্গলার রাজধানী সরাইয়া ঢাকায় লইয়া আসিলেন। সম্রাটের নামে ঢাকার জাহাঙ্গীর নগর নামকরণ হইল। ঢাকায় তিনি একটি দুর্গ এবং রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন।

ঢাকায় রাজধানী লইয়া আসিবার প্রধান কারণ বাঙ্গলায় ফিরিঙ্গির উৎপাত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইয়োরোপের অন্তর্গত পর্ত্তুগাল দেশের কতিপয় অধিবাসী আরাকান এবং চট্টগ্রামের

উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করে। ইঁহারা কৌশলী যোদ্ধা অসমসাহসী বীর এবং উৎকৃষ্ট নাবিক ছিল। সেইজন্য স্থানীয় রাজারা যুদ্ধে ইহাদিগকে নিয়োগ করিয়া ইহাদের ব্যবহারে তুষ্ট হইয়া ইহাদিগকে অনেক যায়গা জমি দিয়াছিলেন। কিন্তু আরাকানের রাজা ইহাদের দুর্দ্দান্ত স্বভাবে ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাদিগের মধ্যে অনেককে নিহত করেন। বাকী যাহারা ছিল তাহারা পলাইয়া গিয়া নিকটবর্ত্তী দ্বীপ সকল অধিকার করিয়া জলদস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে লাগিল।

ইহাদের উৎপাত অসহ্য হওয়াতে সন্দ্বীপের শাসনকর্ত্তা পর্ত্তুগীজ এবং ক্রিশ্চিয়ানদিগকে উৎখাত করিয়া ফেলিতে মনস্থ করিলেন। তিনি ৪০টি জাহাজে ৬০০ শত সৈন্য লইয়া ইহারা যে দ্বীপ আশ্রয় করিয়াছিল, তাহা আক্রমণ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে তিনি পর্ত্তুগীজ-দিগের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না, তিনি এবং তাঁহার অনুচর সৈন্যগণ পর্ত্তুগীজদিগের হাতে নিহত হইলেন।

এই যুদ্ধে পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদের খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। তাহারা সিবাষ্টিয়ান গন্থালেস বলিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে হইতে একজনকে তাহাদের সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া সন্দ্বীপ দখল করিতে মনস্থ করিল।

মুসলমানগণ য়ুরোপনিবাসীদিগকে ফিরিঙ্গি বলিত। পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গিগণ প্রথমে ব্যবসার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, তখনকার

দিন জলযুদ্ধে তাহাদের খুব খ্যাতি ছিল, সেইজন্য তাহারা ভারতবর্ষে আসিয়া এই দেশে একটি সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, মালাবার উপকূলে গোয়া বলিয়া একটি প্রসিদ্ধ বন্দর অধিকার করিয়া আরব এবং পারস্য সাগরের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশগুলির উপরে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, ইহারা অত্যাচারী এবং নিষ্ঠুর ছিল বলিয়া ভারতবাসিগণ ইহাদিগকে দেখিতে পারিত না, এই ফিরিঙ্গি বোম্বেটে-গণ বঙ্গোপসাগরে আসিয়া সন্দ্বীপ এবং নিকটবর্ত্তী দ্বীপ সকল অধিকার করিয়া মোগল সম্রাটের অধীনস্থ হিন্দু এবং মুসলমান প্রজাদিগের উপর অকথ্য অত্যাচার করিত, জোর করিয়া তাহাদিগকে ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিত; হিন্দু-মুসলমান স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের আত্মীয়দের আশ্রয় হইতে কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগের সতীত্ব নষ্ট করিত, কখনও কখনও বা তাহাদিগকে বিবাহ করিত। বাঙ্গালী-দিগের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না।

সন্দ্বীপ অধিকার করিয়া গঞ্জালেস আরাকান রাজার সহিত সন্ধি করিলেন, ইহাদিগের মধ্যে ঠিক হইল যে আরাকান রাজ সৈন্য লইয়া স্থলযোগে বাঙ্গলা আক্রমণ করিবেন, এবং পর্ত্তুগীজগণ যুদ্ধ জাহাজ লইয়া তাঁহার সহিত সহযোগিতা করিবে, যুদ্ধে যাহা পাওয়া যাইবে তাহা উভয়ের মধ্যে সমানভাগে ভাগাভাগি হইবে। এই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে আরাকান রাজ মেঘনার পূর্ব্বতটবর্ত্তী কয়েকটি স্থান জয় করিলেন, কিন্তু ইসলাম খাঁ যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া বাঙ্গলা

হইতে তাঁহাকে বিতাড়িত করিলেন। আরাকান রাজ যুদ্ধের পূর্ব্বে তাঁহার সমস্ত নৌপোত গন্জালেসকে সাহায্যের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। গন্জালেসের মতন বিশ্বাসঘাতক লোক খুব কম ছিল, আরাকানরাজকে সাহায্য করা দূরের কথা তিনি তাঁহার নৌপোতাধ্যক্ষদিগকে তাঁহার নিজের জাহাজে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া সকলকে হত্যা করিলেন, তাহার পরে তাঁহার সমস্ত জাহাজ লইয়া আরাকানের উপকূল লুণ্ঠন করিয়া আরাকান নদীর মধ্যে দিয়া গিয়া আরাকানের বন্দরস্থিত সমস্ত বাণিজ্যপোত গুলি জুলুম করিয়া দখল করিলেন, কিন্তু যখন তিনি আরাকান সহর আক্রমণ করিলেন, তখন রাজা তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

সন্দ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া তিনি ঠিক করিলেন যে তাঁহার একার সামর্থ্যে আরাকান জয় করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, সেইজন্য তিনি গোয়ার পর্ত্তুগীজ রাজপ্রতিনিধির কাছে সাহায্য ভিক্ষা করিয়া দূত পাঠাইলেন। আরাকান দেশ জয় করিবার লোভে প্রলুব্ধ হইয়া গোয়ার কর্ত্তৃপক্ষ কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ একজন পর্ত্তুগীজ সেনাপতির অধীনে পাঠাইলেন, এই সেনাপতি গন্জালেসের নৌ-বহরের সহিত সম্মিলিত না হইয়াই সরাসরি আরাকান বন্দরে প্রবেশ করিলেন, আরাকান রাজা কতকগুলি ওলন্দাজ জাহাজের পোতাধ্যক্ষের নিকট সাহায্য পাইয়াছিলেন, সেইজন্য পর্ত্তুগীজগণ আরাকানাধিপতির সঙ্গে

যুদ্ধে হারিয়া গেলেন, অগত্যা এই সেনাপতিটি সন্দ্বীপে গঞ্জালেসের নিকট দূত পাঠাইয়া তাহার সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। গঞ্জালিস অনতিবিলম্বে পর্ত্তুগীজ বোম্বেটে লইয়া আরাকান বন্দরে প্রবেশ করিলেন। আরাকান পোত এবং ওলন্দাজ পোত একত্র মিলিত হইয়া পর্ত্তুগীজগণকে নৌযুদ্ধে পরাজিত করিল, গোয়ার পর্ত্তুগীজ সেনাপতি যুদ্ধে নিহত হইল, গঞ্জালেস কয়েকটি জাহাজ লইয়া সন্দ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। আরাকান রাজ পরে সৈন্যসামন্ত এবং যুদ্ধ জাহাজ লইয়া সন্দ্বীপ আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে গঞ্জালেস পরাজিত হইলেন, বাঙ্গলার সমুদ্রতটের নিকটবর্ত্তী সমস্ত দ্বীপগুলি আরাকানের অধিবাসীরা অধিকার করিল। পর্ত্তুগীজের উৎপাত চলিয়া গেল বটে, কিন্তু এখন হইতে বাঙ্গলায় মগের উৎপাত আরম্ভ হইল। ইহারা বাঙ্গলার সমুদ্রতটবর্ত্তী দেশ সকল আক্রমণ করিয়া বহুসংখ্যক বাঙ্গালী বন্দী করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল, বাঙ্গালার দক্ষিণদেশে হাহাকার পড়িয়া গেল এবং ইহাদের ভয়ে এবং দৌরাত্ম্যে বাঙ্গলাদেশের কতক-গুলি জেলা একেবারে জনশূন্য হইয়া গেল।

বাঙ্গলার বারভুঁইয়া

ইঁহারা বাঙ্গলার বার জন ভৌমিক বা রাজা উপাধিধারী জমিদার। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই আকবরের সমসাময়িক। রাজা মানসিংহ যখন বাঙ্গলা আক্রমণ করেন, তখন কাহারও কাহারও সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মুসলমান রাজত্বের সময়েও ইঁহারা স্বাধীনভাবে ইঁহাদের জমিদারি শাসন করিতেছিলেন। সম্রাট আকবরসাহ তাঁহাদের নিকট হইতে বাঙ্গলার রাজস্ব আদায় করিতেন, আবশ্যক হইলে সৈন্যসামন্ত দ্বারা তাঁহারা সম্রাটকে সাহায্য করিতেন।

ইঁহাদের মধ্যে যশোহরের প্রতাপাদিত্য, ভূষণার মুকুন্দরাম বিক্রমপুরের চাঁদরায় ও কেদাররায়, জঙ্গলবাড়ীর ঈশা খাঁ বিখ্যাত। ভূষণার মুকুন্দরামের বংশে রাজা সীতারামের জন্ম হয়।

প্রতাপাদিত্য।

"যশোর নগর ধাম প্রতাপাদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহে আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥

প্রতাপাদিত্যের উপাধি গুহ, ইনি বঙ্গজ কায়স্থ, ইঁহার পিতার নাম শ্রীহরি। গৌড়নগরে প্রতাপাদিত্যের জন্ম হয়। প্রতাপাদিত্যের

খুড়া জানকীবল্লভ। বাঙ্গলায় যখন সুলেমান শা :কেরানি সুলতান ছিলেন, তখন ইনি এই দুই ভাইকে মন্ত্রীর পদ দিয়াছিলেন। সুলেমান শাহ ইঁহাদের কাজে খুব সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীহরিকে "বিক্রমাদিত্য" এবং জানকীবল্লভকে "বসন্তরায়" উপাধি দেন। ইহার পরে এই উপাধিতেই এই দুইজন রাজকর্ম্মচারী বাঙ্গলায় পরিচিত দিলেন।

শ্রীহরির বৃদ্ধ বয়সে প্রতাপের জন্ম হয়। গল্প আছে যে জন্মমাত্র প্রতাপ অত্যন্ত বিকৃত রব করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ভয় পাইয়া নবজাত ছেলেটিকে ত্যাগ করিতে চাহিলেন, কিন্তু প্রতাপের মা কিছুতেই সন্তান ত্যাগ করিলেন না; যখন প্রতাপের কুষ্ঠী তৈয়ারি হইল তখন দেখা গেল যে ভবিষ্যতে প্রতাপ স্বাধীন রাজা হইবেন বটে,কিন্তু তাঁহার পিতৃদ্রোহ যোগ ছিল এইজন্য বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে বর্জ্জন করিতে চাহিলেন, কিন্তু এবারও সকলের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না।

বাল্যকালে প্রতাপ আরবি এবং পারস্য ভাষা শিখিয়া ফেলেন। অল্প বয়সেই তিনি অশ্বারোহণ এবং অস্ত্রচালনায় সুদক্ষ হইয়াছিলেন।

বসন্ত রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দরায় প্রতাপের সমবয়স্ক ছিলেন কিন্তু প্রতাপের সঙ্গে কোন বিষয়েই তিনি পারিয়া উঠিতেন না বলিয়া প্রতাপের উপর তাঁহার খুব হিংসা ছিল।

একদিন প্রতাপ ও গোবিন্দ উভয়েই গৃহের ছাদের উপরে

বেড়াইতেছিলেন, উভয়ের হাতে তীরধনু ছিল। সহসা একটা চিল তাঁহাদের মাথার উপর দিয়া যাইতে লাগিল; প্রতাপ এবং গোবিন্দ উভয়েই লক্ষ্য করিয়া তাহার দিকে তীর ছুড়িলেন। প্রতাপের অব্যর্থ লক্ষ্যে চিলটি বাণবিদ্ধ হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। বিক্রমাদিত্যের মনে প্রতাপের কুষ্ঠীর কথা মনে পড়িল; তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন। কিন্তু তাঁহার ভাই প্রতাপের বিশেষ প্রশংসা করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সান্ত্বনা দিলেন। নিজের পিতাও প্রতাপের গুণমুগ্ধ দেখিয়া গোবিন্দের হিংসা আরও বাড়িয়া গেল।

সুলেমান শা কেরানির মৃত্যুর পর দায়ূদ বাঙ্গলার সুলতান হইয়া সম্রাটের প্রাপ্য কর বন্ধ করিয়া দিলেন। চারিদিকে বাঙ্গলায় পাঠানদের মধ্যে যুদ্ধ সাজের আয়োজন চলিতে লাগিল। দায়ূদ যুদ্ধের পূর্ব্বে তাঁহার পিতার বিশ্বাসী মন্ত্রী বিক্রমাদিত্যকে চাঁদখা বলিয়া কপোতাক্ষী ও ইচ্ছামতী নদীর মধ্যবর্ত্তী পরগণা জাইগীর স্বরূপ দান করিলেন। বিক্রমাদিত্য দায়ুদখাঁর অনুমতি লইয়া এই জঙ্গলাকীর্ণ দেশে বসতি স্থাপন করিবার জন্য চলিয়া আসিলেন। তিনি যশোহর নগর নির্ম্মাণ করিলেন এবং গ্রাসাচ্ছাদনের ভূমি দান করিয়া বহুসংখ্যক লোককে এই নূতন পত্তনীতে আকৃষ্ট করিলেন। বিক্রমাদিত্য যুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে নিজের আত্মীয় স্বজনদিগকে যশোহরে পাঠাইয়া নিজে গৌড়ে রহিলেন। প্রতাপও যশোহরে গেলেন, দায়ুদখাঁ নিজের ধনরত্ন ও বেগম

সাহেবাদিগের মধ্যে অনেককেই তাঁহার প্রিয় মন্ত্রীর সুরক্ষিত নগরে পাঠাইলেন। সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দায়ুদখাঁ বিহারের দিকে অগ্রসর হইলেন। বিক্রমাদিত্য এবং বসন্তরায় ভারপ্রাপ্ত হইয়া গৌড়ে রহিলেন। দায়ুদখাঁ হাজিপুরের যুদ্ধে মোগল সৈন্যের নিকটে পরাজিত হইয়া উড়িষ্যার দিকে পলাইয়া গেলেন। এদিকে বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় রাজকীয় আবশ্যক কাগজ পত্র মাটিতে পুতিয়া রাখিয়া গৌড় ছাড়িয়া যশোহরে চলিয়া আসিলেন। মুনিমখাঁ দায়ুদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া বাঙ্গলা দেশ লাভ করিয়া উড়িষ্যা দেশ তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। সন্ধির পরে মুনিমখাঁ গৌড়ে আসিলেন। গৌড়ের মতন সমৃদ্ধশালী সহর তখন এসিয়া মহাদেশেও কম ছিল, কিন্তু পাঠান গৌরবরবি অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গৌড়ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। মুনিমখাঁর এখানে আসার কিছুদিন পরে এই গৌড়ে একটি ভীষণ মড়কের আবির্ভাব হইল। এত লোক মরিতে লাগিল যে লোকে শবদাহ করিত না পারিয়া মৃতদেহ গঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে মহানগরী গৌড় ভারতের মানচিত্র হইতে বিলুপ্ত হইল। মুনিম খাঁ ও এই মহামারীতে দেহত্যাগ করিলেন। বিক্রমাদিত্য যখন উড়িষ্যায় এই খবর দায়ুদখাঁকে পাঠাইলেন তখন দায়ুদ খাঁ পুনরায় মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিলেন; এবার আকবর খাঁ জাহান এবং টোডরমল্লকে বাঙ্গলা দেশে পাঠাইলেন। পাঠানগণ

মরিয়া হইয়া লড়িতে লাগিলেন। দায়ুদের মেসো দ্বিতীয় কালাপাহাড় প্রভৃত বীরত্বের সহিত মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়া বীরের সদ্গতি লাভ করিলেন। দায়ুদও যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলেন। বাঙ্গলা দেশ পুনরায় মোগলের হাতে আসিল। কিন্তু রাজস্ব বিষয়ক সমস্ত কাগজ পত্র দায়ুদের মন্ত্রী বিক্রমাদিত্য মাটিতে পুতিয়া রাখিয়া যশোহরে চলিয়া গিয়াছিলেন, সেইগুলি না পাইলে বাঙ্গলা দেশ শাসন করা চলে না, সেইজন্য টোডরমল্ল ঢেঁড়া পিটিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে বাঙ্গলার রাজস্ব বিষয়ক কাগজ পত্র তাঁহাকে যিনি বুঝাইয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে তিনি বিশেষ পুরস্কৃত করিবেন। সুলতান দায়ুদের মৃত্যুর পর বিক্রমাদিত্যের ও বসন্তরায়ের আশা ভরসা সমস্ত চলিয়া গিয়াছিল। মোগলের সহিত বোঝা পড়া না করিলে, বাকী জীবনটা অশান্তিতে কাটিতে হইবে, এই ভাবিয়া তাঁহারা টোডরমল্লকে রাজস্ব বিষয়ক কাগজ পত্র সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন। টোডরমল্ল তাঁহাদের কথামত, এই দুই ভাইকে তাঁহাদের জাইগীরে বহাল রাখিলেন, এবং তাঁহাদের কাগজ পত্র দেখিয়া বাঙ্গলায় নূতন রকমের রাজস্ব বিষয়ক নিয়ম প্রচার করিয়া দিলেন।

পাঠানদিগের অধীনে কাজ করিয়া প্রতাপের পিতা ও পিতৃব্যের সৌভাগ্য এবং সমৃদ্ধি হইয়াছিল। দায়ুদের মৃত্যুতে প্রতাপের মনে বিশেষ আঘাত লাগিয়াছিল; মোগলদিগকে তিনি কখনও প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন নাই।

এই সময়ে প্রতাপের কয়েকটি বন্ধুলাভ হয়, তাঁহাদের মধ্যে প্রতাপসিংহ দত্ত, সূর্য্যকান্ত গুহ ও কালিদাস রায়ই প্রধান, তাহাদিগকে লইয়া প্রতাপ মৃগয়ায় বাহির হইতেন। প্রতাপ রামায়ণ ও মহাভারত পড়িতেন, এই দুইটী মহাকাব্য পড়িয়া তাঁহার মনে বীরত্বের নূতন ছাপ পড়ে।

রাজমহলের যুদ্ধের পর বিক্রমাদিত্য যশোহরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন, এই সময়ে চন্দ্রদ্বীপের এক রাজকুমারীর সহিত ধুমধামের সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ হয়।

টোডরমল্ল যখন দিল্লীতে ফিরিয়া যান তখন তিনি বসন্তরায়কে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। বিক্রমাদিত্যের শরীর তখন খারাপ ছিল, তিনি রাজকার্য্যের ভার বসন্তরায়ের হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। বসন্তরায়কে সেইজন্য দিল্লীতে পাঠাইতে তাঁহার মন সরিল না, তিনি তাঁহার বদলে প্রতাপকে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ দিল্লীতে পাঠাইলেন, তখন প্রতাপের বয়স মাত্র চৌদ্দ বৎসর, প্রতাপের সুন্দর চেহারা এবং তাঁহার অমায়িকতায় টোডরমল্ল খুব খুসী হইলেন। প্রতাপ তাঁহার সঙ্গে তাঁহার দুইটি সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধু সূর্য্যকান্ত এবং প্রতাপসিংহ দত্তকে লইলেন। টোডরমল্ল প্রথম হইতে প্রতাপকে খুব ভালবাসিতেন, সেইজন্য পথে তাঁহার কোন কষ্ট কিংবা অসুবিধা হয় নাই। দিল্লীতে আসার পর টোডরমল্লের সাহায্যে প্রতাপের বাদসাহের দর্শন পাইতেও বিশেষ বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু তখন

দিল্লীর পথঘাট চিতোরের রাণা প্রতাপ সিংহের যশোগাথায় মুখরিত হইত ; এই শ্রেষ্ঠ বীরের সর্ব্বস্ব গিয়াছিল, তৃণ শয্যা এবং অসি মাত্র তাঁহার আশ্রয় ছিল, কিন্তু তেজস্বিতা এবং বীরত্বে তখন ভারতে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। আকবরের গুণগ্রাহী সভাকবি খাঁ খাঁনান প্রতাপসিংহ সম্বন্ধে একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার মর্ম্ম এইরূপ, "এই পৃথিবীতে সকলই ক্ষণস্থায়ী সম্পত্তি বা অর্থ চিরদিন থাকে না। কিন্তু মহৎ নামের গৌরব কখনই লুপ্ত হয় না, চিরকাল সমুজ্জ্বল থাকে। প্রতাপসিংহ রাজ্যভ্রষ্ট ও হৃত সর্ব্বস্ব হইয়াও মস্তক নত করেন নাই। শত্রুর প্রসাদ ভিখারী হন নাই। ভারতীয় রাজন্যগণের মধ্যে একাকী তিনিই হিন্দু নামের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।" প্রতাপাদিত্যের মনে স্বনামধারী বীরের অপূর্ব্ব মহিমা অনুকরণের স্পৃহা প্রবল হইল। আরাবল্লী পর্ব্বতের আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতাপসিংহ যেমন ভারতের বাদসাহের শক্তিকে উপেক্ষা করিয়াছেন বাঙ্গলার সমুদ্র কূলস্থ সুন্দর বনেও যে সেইরূপ করা যাইতে পারে তাহা প্রতাপের দৃঢ় বিশ্বাস হইল।

দিল্লীতে প্রতাপ পাঁচবৎসর ছিলেন, তিনি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মোগল দরবারের রাজনীতির গূঢ় রহস্য এবং তাঁহাদের যুদ্ধ কৌশল শিখিয়া লইলেন। এই সময়ে তাঁহার সহিত যুবরাজ সেলিমের সহিত পরিচয় হয়, যুবরাজ সেলিমও প্রতাপকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। এই সময়ে আবার বাঙ্গলায় জায়গীরদের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে

আকবর টোডরমল্লকে বাঙ্গলায় পাঠাইলেন, তাঁহার বাঙ্গলায় অনুপস্থিতির সময়ে দিল্লীতে প্রতাপ একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। তাঁহার খুড়া প্রতাপের নিকট দিল্লীতে চাঁদ খাঁ পরগণার রাজস্ব পাঠাইতেন প্রতাপ সেই সংবাদ গোপন করিয়া একজন কর্ম্মচারী দ্বারা সম্রাটকে জানাইলেন যে চাঁদ খাঁ পরগণার রাজস্ব বাকী পড়িয়াছে। সম্রাট ক্রুদ্ধ হইয়া জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু প্রতাপ সম্রাটের কাছে নিবেদন করিলেন যে তাঁহার পিতা বৃদ্ধ হওয়াতে তাঁহার খুড়ার হাতে রাজস্ব দিবার ভার আছে, কিন্তু খুড়া অধিকাংশ সময় ধর্ম্ম কার্য্যে ব্যয় করেন বলিয়া রাজস্ব বাকী পড়িয়াছে, সম্রাটের অনুমতি হইলে, প্রতাপ নিজে বাকী রাজস্ব দিতে প্রস্তুত আছেন। সম্রাট খুসী হইয়া প্রতাপের নামে চাঁদ খাঁ সনন্দ লিখিয়া তাঁহাকে রাজা উপাধি দিলেন।

পাঁচ বৎসর পরে হঠাৎ যশোহরে প্রতাপকে ফিরিতে দেখিয়া—বসন্তরায় এবং বিক্রমাদিত্য উভয়েই আশ্চর্য্য হইলেন। কিন্তু পরে সমস্ত খবর জানিতে পারিয়া উভয়েই মর্ম্মাহত হইলেন। বিক্রমাদিত্য বৃদ্ধ এবং অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি এই ব্যাপারে শয্যা লইলেন, এবং অল্প দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পরে তিনি জমিদারীর দশ আনি অংশ প্রতাপকে এবং ছ আনি তাঁহার ভাইকে দিয়া যান।

বসন্তরায় প্রতাপের ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু

ভাইএর মৃত্যুর পর তিনি প্রতাপাদিত্যকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া জমিদারী ভাগ করিয়া দিলেন, এবং যথাসাধ্য তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন, বসন্ত রায়ের ব্যবহারে প্রতাপ নিজের নীচতায় যেমনি লজ্জিত হইলেন, অপর দিকে বসন্তরায়ের মহদন্তকরণের পরিচয় পাইয়া তেমনি চমৎকৃত হইলেন। রাজা হইয়া তিনি বিক্রমপুরস্থিত শ্রীপুরের রাজা কেদার রায় এবং চাঁদরায়ের সহিত মিত্রতা করিলেন।

কিছুদিন পরে পুনরায় প্রতাপ এবং বসন্তরায়ের মধ্যে মনোমালিন্য আরম্ভ হইল। তখন সন্দীপ পর্ত্তুগীজদিগের অধীনে ছিল। প্রতাপ কালিন্দীতীরে ধূমঘাট নামক স্থানে তাঁহার নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন। যশোহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে কয়েকটি কেল্লা নির্ম্মাণ করিলেন। কালিন্দীতীরে বংশীপুর নামক স্থানে একটি দুর্গ এবং রাজবাটী নির্ম্মান করিয়াছিলেন। দুর্গটি এমন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে নদীপথে কোন শত্রুসৈন্য আসিলে সহজে তাহাদিগকে এখান হইতে বাধা দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া প্রতাপাদিত্য দিল্লী হইতে আসিবার সময় কমল খোঁজা নামক একজন হাবসীদেশীয় অশ্বনায়ক আনিয়াছিলেন, তাঁহার সাহায্যে তিনি দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য শিক্ষিত করিলেন। তিনি দেশের লোককে যুদ্ধ শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অনেক উচ্চবংশীয় বাঙ্গালী সন্তান তাঁহার অধীনে পদাতিসৈন্য ছিলেন। প্রতাপ পর্ত্তুগীজদিগের মতন রণতরী

প্রস্তুত করেন। তিনি পর্ত্তুগীজের সাহায্যে বাঙ্গলায় মগের উৎপাত দূর করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করেন।

পাঠান বিদ্রোহী কতলুখাঁকে দমন করিবার জন্য সম্রাট আকবর ১৫৮৮ খৃঃ অব্দে মানসিংহকে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান। প্রতাপাদিত্য উড়িষ্যায় সৈন্য সামন্ত লইয়া মানসিংহের সহিত যোগ দেন। প্রতাপাদিত্যকে দেখিয়া মানসিংহের অত্যন্ত আনন্দ হয়, তিনি এই প্রতাপকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখেন, প্রতাপও সম্রাটের যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া, তাঁহার প্রিয় হন। মানসিংহ বাঙ্গালায় রাজস্ব বিষয়ক বন্দোবস্ত করেন, তাঁহার সময়ে বিশেষতঃ হুগলীর ফৌজদারের দ্বারা বাঙ্গলার প্রজারা অত্যন্ত উৎপীড়িত হয়। দলে দলে তাঁহারা পলাইয়া প্রতাপাদিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ক্রমশঃ যশোহর সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিল। ইহার জন্য প্রতাপের উপর হুগলীর ফৌজদার অত্যন্ত চটিয়া যান।

প্রতাপ দেখিলেন যে তাঁহার খুড়ার জমিদারীভুক্ত চাক্‌সিরি বলিয়া ভূখণ্ড পাইলে তিনি সহজে পর্ত্তুগীজদিগকে দমন করিতে পারেন। কিন্তু বসন্তরায়ের পুত্র গোবিন্দরায় তখন প্রতাপের সৌভাগ্য দেখিয়া হিংসায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিলেন, তিনি প্রতাপকে চাক্‌সিরি দিতে দিলেন না। প্রতাপ সম্বন্ধে এই সময়ে একটি প্রবাদ আছে "সারারাত ঘুরে মরি তবু না পাই চাক্‌সিরি"।— বসন্তরায়ের ব্যবহারে প্রতাপ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন।

এই সময়ে মানসিংহ বাঙ্গলা ছাড়িয়া দক্ষিণ-পথে গমন করেন। হুগলীর ফৌজদার প্রতাপের প্রবল শত্রু ছিল। মানসিংহের পরে বাঙ্গলায় যিনি শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলেন হুগলীর ফৌজদার অতি সহজেই তাঁহাকে নিজের হাতের মুঠায় লইয়া আসিলেন, এবং নানা প্রকার উপায়ে প্রতাপকে অবমানিত করিতে লাগিলেন। প্রতাপ এই অপমানে ক্ষিপ্ত প্রায় হইলেন, তাঁহার মনে মোগলের অধীনতা হইতে স্বাধীন হইবার সংকল্প দৃঢ় হইতে লাগিল। বসন্তরায় বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয় ভাগ্য গগনের পরিবর্ত্তন দেখিয়াছিলেন, তিনি প্রতাপকে এই সংকল্প হইতে বিরত হইতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু প্রতাপাদিত্য তাঁহার পরামর্শ না গ্রাহ্য করিয়াই ১৫৯৯ খৃঃঅব্দে নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ধূমঘাটে মহাসমারোহে তিনি সিংহাসন আরোহণ করেন। এই সময়ে বাঙ্গলার অপরাপর ভুঁইয়াগণ তাঁহার সভায় আসিয়া তাঁহার কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাজ্যাভি-ষেকের দিন প্রতাপাদিত্য কল্পতরু হইয়াছিলেন, যে যাহা তাঁহার কাছে যাজ্ঞা করিয়াছিল, সে তাহাই পাইল, কথিত আছে যে একজন ব্রাহ্মণ মহারাজকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার কাছে তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্টা মহারাণীকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অন্যায় প্রার্থনায় সভাস্থ সকলেই রুষ্ট হইল, কিন্তু প্রতাপ তাঁহার হাতে তাঁহার মহারাণীকে দান করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রতাপের উদারতায় বিহ্বল হইয়া গেলেন, তিনি মহারাণীর ওজনে সোনা লইয়া

মহারাণীকে ফিরাইয়া দিলেন। প্রতাপের দানশীলতায় তিনি সমস্ত লোকের নিকটে প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন।

প্রতাপ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন বসন্তরায় বিপদের এত কাছাকাছি থাকা যুক্তি সঙ্গত মনে না করিয়া কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বেহালা গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। স্বাধীন হইবার পর প্রতাপ নিজের নামে টাকা মুদ্রিত করিলেন।

বাঙ্গলার সুবাদার এবং হুগলীর ফৌজদার যে সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন তাহা উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া সৈন্য সামন্ত লইয়া প্রতাপকে আক্রমণ করিলেন। সংগ্রামপুরের যুদ্ধে উভয়েই পরাজিত হইয়া ইচ্ছামতী নদী পার হইয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধের পর মোগলদিগের শক্তি কিছুকালের জন্য উড়িষ্যার পাঠান বিদ্রোহ দমন করিতে নিয়োজিত ছিল বলিয়া প্রতাপাদিত্য কয়েক বৎসরের জন্য নিশ্চিন্ত হইলেন।

প্রতাপাদিত্য যদিও হিন্দু ছিলেন কিন্তু তিনি অন্যান্য ধর্ম্মের উপর কখনও অত্যাচার করেন নাই। মুসলমানদিগের উপাসনার জন্য তিনি ধূমঘাটে তাঁহার নিজের ব্যয়ে একটি মস্‌জিদ্‌ এবং পর্ত্তুগীজদিগের জন্য একটি গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে প্রতাপ বাকলার অধিপতি রামচন্দ্র রায়ের সহিত তাঁহার কন্যা বিন্দুমতীর বিবাহ দেন, কিন্তু বাসর রাত্রে

তাঁহার জামাইএর রামাইভাঁড় নামে একজন পার্শ্বচর মেয়ের পোষাক পরিয়া রাজবাড়ীর মেয়েদের সহিত ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, প্রতাপের কাণে যখন এই কথা গেল তখন তিনি ভাবিলেন যে রামচন্দ্র তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য এইরূপ করিয়াছেন, তিনি জামাইকে বধ করিয়া ইহার শোধ লইবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। কথা ছিল বিবাহরাত্রে বরকন্যা বসন্তরায়ের গৃহে অবস্থান করিবেন; কিন্তু প্রতাপের প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া রামচন্দ্র ভীত হইয়া সেই রাত্রেই মশাল-বাহকের বেশ লইয়া বাকলায় পলাইয়া গেলেন। প্রতাপাদিত্য ভাবিলেন যে খুড়ার পরামর্শেই রামচন্দ্র এইরূপ পলাইতে পারিয়াছেন, সেইজন্য বসন্তরায়ের উপর তাঁহার রাগ আরও বাড়িল।

বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া যখন বসন্তরায় যশোহরে ছিলেন সেই সময়ে তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধের তিথি উপস্থিত হইল। বসন্তরায় প্রতাপকে ও তাঁহার আত্মীয়স্বজনবর্গকে সেই উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু বসন্তরায়ের ব্যবহারে প্রতাপ তাঁহার উপর সন্দিগ্ধ ছিলেন, এইজন্য খুড়ার বাড়ীতে যাইবার সময় তিনি সশস্ত্র অনুচর সঙ্গে নিলেন। কিন্তু বসন্তরায়ের দরোয়ান প্রতাপকে প্রবেশ করিতে বাধা না দিয়া তাঁহার সশস্ত্র অনুচরদিগকে প্রবেশ করিতে দিল না, প্রতাপ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দরোয়ানকে অস্ত্রাঘাত করিলেন, গোবিন্দরায় বাহিরের গোলমাল শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতাপকে লক্ষ্য

করিয়া তীর ছুড়িলেন, কিন্তু তীরের লক্ষ্য ব্যর্থ হইল, আর একটি তীর যেমন তিনি ধনুতে যোজনা করিবেন অমনি প্রতাপ ক্রুদ্ধ শার্দ্দুলের ন্যায় তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া খড়্গাঘাতে তাহার মুণ্ডপাত করিলেন। বসন্তরায় অন্তঃপুরে এই গোলমালের খবর পাইয়া তাঁহার অনুচরকে তাঁহার "গঙ্গাজল" নামক খড়্গ আনিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু তাহারা না বুঝিতে পারিয়া পাত্রে করিয়া তাঁহার সম্মুখে গঙ্গাজল আনিয়া দিল। "গঙ্গাজল" অস্ত্রের নামে প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি বসন্তরায়কেও খড়্গ দ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন, চারিদিকে খুব গোলমাল পড়িয়া গেল, বসন্তরায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রাঘব রায়ের বয়স তখন বারো বৎসর—তাহাকে লইয়া তাহার ধাত্রী নিকটবর্ত্তী একটি কচুবনে পলাইয়া রহিল। ইহা হইতে রাঘবরায় সকলের নিকটে কচুরায় নামে পরিচিত হইলেন।

যখন রাগ পড়িয়া গেল তখন প্রতাপাদিত্য কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কচুরায় এবং বসন্তরায়ের দেওয়ান রূপবসু যখন যশোহর ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন, তখন তিনি তাহাদিগকে বাধা দিলেন না। কিন্তু তাঁহার খুড়ার পরিবারবর্গের তিনি বিশেষ যত্ন লইতে লাগিলেন। বসন্তরায়ের যায়গা জমি ইহার পর তাঁহার রাজ্যের সহিত যুক্ত হইল।

কচুরায় এবং রূপবসু পলাইয়া হুগলীর ফৌজদারের নিকটে গেলেন, হুগলীর ফৌজদার অনেকবার চেষ্টা করিয়াও

প্রতাপের কিছু করিতে পারেন নাই। তিনি সাদরে কচুরায়কে আশ্রয় দিলেন, সেখানে থাকিয়া কচুরায় পারস্যভাষা শিখিলেন এবং তাঁহার পরামর্শে তাঁহাদের অভিযোগ সম্রাটের কাছে নিবেদন করিবার জন্য দিল্লীতে চলিয়া গেলেন।

দিল্লীতে আকবরের মৃত্যু হইয়াছে এবং সেলিমসাহ জাহাঙ্গীর হইয়া ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কচুরায় সম্রাটের কাছে তাঁহার দুঃখ ও প্রতাপের অত্যাচার এবং স্বেচ্ছাচারিতার কথা নিবেদন করিলেন। জাহাঙ্গীর প্রতাপকে দমন করিবার জন্য প্রায় দেড়লক্ষ মোগল ও রাজপুত সৈন্য দিয়া মানসিংহকে বাঙ্গলা দেশে পাঠাইলেন।

মানসিংহ বাঙ্গলা দেশে বরিশার সাবর্ণ চৌধুরীর পূর্ব্বপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারকে হাত করিলেন, ইহাকে অনাথ এবং নিরাশ্রয় দেখিয়া প্রতাপ যশোহরেশ্বরীর সেবাইত পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রতাপ ইঁহাকে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু মানসিংহ বাঙ্গলায় আসিয়া পৌছিলে, ইনি প্রতাপের আশ্রয় ছাড়িয়া গোপনে মানসিংহের দলে যোগ দিলেন, মানসিংহ ইহার কাছ হইতে অনেক গোপনীয় তথ্য সংগ্রহ করিলেন। ভবানন্দ মজুমদার কৃষ্ণনগরের রাজপরিবারের আদিপুরুষ; ইনিও মানসিংহকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিলেন। তখন চৈত্রমাস; প্রতাপাদিত্য ভাবিয়াছিলেন যে যদি এই সময়ে মানসিংহকে ভাগিরথী পার হইতে

বাধা দিতে পারেন, তাহা হইলে বর্ষাকালে মানসিংহের ভাগিরথী উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব হইবে, কিন্তু মানসিংহ বাঙ্গালী অনুচরের সাহায্যে প্রতাপের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া নবদ্বীপের নিকট ভাগিরথী উত্তীর্ণ হইলেন। মানসিংহের অসংখ্য সৈন্যদলকে বাধা দিবার জন্য প্রতাপাদিত্যের নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে হইল। তিনি ঠিক করিলেন যে মানসিংহকে অতর্কিত অবস্থায় আক্রমণ করিবেন। এই উদ্দেশ্য লইয়া প্রতাপ মানসিংহের সৈন্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন, কিন্তু হঠাৎ আকাশে ঘন ঘোরঘটা করিয়া মেঘ জমিয়া উঠিল, প্রবল ঝড় এবং মুসলধারে বৃষ্টি নামিল, রাস্তাঘাট জলে ডুবিয়া গেল,—এইরূপ এক সপ্তাহ ধরিয়া অনবরত ঝড় এবং বৃষ্টি হইতে লাগিল। প্রতাপ যুদ্ধ করিবার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। এদিকে মানসিংহের ক্ষতি প্রতাপ অপেক্ষা যথেষ্ট বেশী হইয়াছিল, এবং প্রতাপ যদি এই অবস্থায় মানসিংহকে আক্রমণ করিতেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই জয়লাভ করিতেন। কিন্তু প্রতাপের সেনাপতিগণ প্রতাপকে যশোহর রক্ষা করিবার পরামর্শ দিলেন। প্রতাপ যশোহর রক্ষার সমুচিত ব্যবস্থা করিয়া মানসিংহের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যশোহরের নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের প্রজাগণ এই বিপদের সময়ে যশোহরে আসিয়া বাসা বাঁধিলেন। মানসিংহ ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে যশোহর নদীর পশ্চিমে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন, শত্রুর গোলাগুলির মুখে যশোহর নদী পার

হওয়া মোগল এবং রাজপুত সৈন্যের পক্ষে অসম্ভব ছিল, সেইজন্য ঠিক হইল যশোহর নদীর পাঁচ ক্রোশ দূরে একটি অরক্ষিত স্থানে গোপনে মানসিংহ তাঁহার সৈন্য পার করিবেন কিন্তু প্রতাপকে ছলনা করিবার জন্য মানসিংহ তাহার সৈন্যদিগকে প্রতাপ যে স্থানে যুদ্ধ করিতে ছিলেন সেইখানেই নদী পার হইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। যখন রাত্রি আসিল গোলন্দাজ গোলাগুলি চালনা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং রাত্রির বিশ্রাম ক্রোড়ে প্রতাপের পরিশ্রান্ত সৈন্যগণ আশ্রয় লইল তখন মানসিংহ পাঁচ ক্রোশ দূরে একই সময়ে তাহার প্রভূত সৈন্য সামন্ত লইয়া নদী উত্তীর্ণ হইলেন। নদী পার হইয়া তিনি ব্যূহ রচনা করিয়া প্রতাপের সৈন্যদলের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এখানে প্রতাপের সহিত মানসিংহের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, এইরূপ যুদ্ধ বাঙ্গলা দেশের ইতিহাসে কখনও হয় নাই। মানসিংহের রাজপুত মোগল এবং তুর্কী সৈন্য শিক্ষিত বাঙ্গালী সৈন্যদিগের নিকট পরাজিত হইল, স্বয়ং মানসিংহ যুদ্ধে আহত হইলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মোগল সৈন্য হটিয়া আসিয়া কিছু দূরে শিবির স্থাপন করিল। সমস্ত দিন ব্যাপী যুদ্ধে বাঙ্গালী সৈন্যের যেরূপ ক্ষতি হইয়াছিল তাহাতে বাঙ্গালী সৈন্যও অগ্রসর হইয়া মানসিংহের সৈন্যকে আক্রমণ করিতে পারিল না। বাঙ্গালী সৈন্যের বীরত্ব এবং যুদ্ধ কৌশল দেখিয়া মানসিংহও কম বিস্মিত হন নাই। কাবুল এবং দক্ষিণাপথ বিজয়ী এইবার বুঝিলেন যে প্রতাপের মতন শত্রু বিরল।

তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিয়া প্রতাপের নিকট লোক পাঠাইলেন, কিন্তু প্রতাপ জানিতেন যে মোগল সম্রাট তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন না, সেইজন্য তিনি মরণ পণ করিয়া লড়িতে চাহিলেন। ইহার পর মানসিংহ যশোহর অবরোধ করিবার সংকল্প করিলেন, চতুর্দ্দিকে ঘাটিতে ঘাটিতে সৈন্য স্থাপনা করিয়া যাহাতে খাদ্যের অভাবে যশোহরবাসিগণ আত্মসমর্পণ করে, তাহাই অবরোধের উদ্দেশ্য। চারিদিক হইতে আশ্রয় পাইবার জন্য প্রতাপাদিত্যের প্রজা যশোহরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, মানসিংহের কৌশলে যশোহরে খাদ্যের সরবরাহ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। অল্পদিনের মধ্যেই প্রতাপাদিত্যের রাজধানীতে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। এদিকে কচু রায় প্রতাপের কর্ম্মচারীবর্গকে স্বপক্ষে আনিতে লাগিল। সম্মুখযুদ্ধে যদিও প্রতাপ মানসিংহকে আর একবার পরাজিত করিলেন, কিন্তু মোগলগণ যশোহর ত্যাগ করিয়া গেল না, তাহারা নিজের সুরক্ষিত শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রহিল।

চারিদিকে বিপদ, জ্ঞাতিবর্গের চক্রান্তে প্রতাপের উপর প্রজাদিগের ভক্তি দিন দিন কমিয়া যাইতে লাগিল। কতিপয় বন্ধু ছাড়া কোন কর্ম্মচারীর বিশ্বাসপরায়ণতায় আস্থা স্থাপন করা যায় না। এই সমস্ত দুর্ভাবনার হাত হইতে অন্ততঃ কিছুকাল অব্যাহতি পাইবার জন্য প্রতাপ মদ খাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। একদিন গভীর নিশীথে প্রতাপ বন্ধু বান্ধব লইয়া পাশাক্রীড়া

করিতেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মদও চলিতেছিল। একটি বৃদ্ধা ভিখারিণী চীৎকার করিয়া তাঁহার কাছে বারংবার অন্ন ভিক্ষা করিতে লাগিল। প্রতাপ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বৃদ্ধাকে বধ্যভূমিতে লইয়া তাহার স্তনদ্বয় কাটিয়া দিতে হুকুম করিলেন। ঘাতক তাহার আদেশ প্রতিপালন করিল। পরদিন সকালে যখন এই খবর চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল, তখন লোকে প্রতাপকে ধিক্কার দিতে লাগিল। জ্ঞাতিশত্রু কচু রায় মানসিংহের শিবির হইতে খবর পাইয়া যাশোহরবাসিদিগের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। প্রতাপের গুরু পুরোহিত আত্মীয় স্বজন সকলেই প্রতাপের পক্ষ ত্যাগ করিয়া গোপনে শত্রুপক্ষের সহিত যোগ দিল। প্রতাপের ভাগিনেয় গুপ্তজয় ছিলেন যশোহর দুর্গ রক্ষক, তিনি তাহাদের চক্রান্তের কথা জানিতেন না, সেইজন্য রাজধানী রক্ষার সাধারণ ব্যবস্থা ছাড়া তিনি কিছুই করেন নাই। যখন গভীর রাত্রি, তখন বিশ্বাসঘাতকের দল পুরদ্বার খুলিয়া দেওয়াতে যশোহরে রাজপুত সৈন্য প্রবেশ করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিল।

গুপ্তজয় যথাসাধ্য দুর্গরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া তিনি অগণ্য রাজপুত এবং মোগল সৈন্যের সঙ্গে পারিবেন কেন? তাহা ছাড়া প্রতাপ তখন ধূমঘাটে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি যথা সময়ে খবর পান নাই। এ জন্য অতি সহজে যশোহর মানসিংহের হাতে আসিল।

প্রতাপ তাঁহাকে ভূমিশায়ী করিয়া যেমনি খড়্গ তুলিলেন

পৃঃ ১০১—বাঙ্গলায় বিদেশী।

মানসিংহ এবং কচুরায় চতুর্দ্দিকে প্রতাপকে গুপ্তচরের দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার সামান্য অভিপ্রায় পর্য্যন্ত মানসিংহ যথা সময়ে জানিতে পারিতেন, এবং যথা সময়ে তাঁহার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিবার বন্দোবস্ত করিতেন। যশোহর পতনের পর প্রতাপ হঠাৎ অতর্কিতভাবে মানসিংহকে আক্রমণ করিবেন ঠিক করিলেন, কিন্তু সে সংবাদও যথা সময়ে মানসিংহের নিকটে পহুঁছিল। কতিপয় সৈন্য লইয়া প্রতাপ মানসিংহের উপরে পড়িয়া তাঁহার শরীররক্ষীদিগকে নিহত করিয়া বাঘের মতন মানসিংহকে আক্রমণ করিলেন। দুইজনের মধ্যে লড়াই হইতে লাগিল। মানসিংহ বৃদ্ধ হইয়াছেন, সেইজন্য প্রতাপের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, প্রতাপ তাঁহাকে ভূমিসায়ী করিয়া যেমনি খড়্গ তুলিলেন, অমনি পশ্চাৎ হইতে কচুরায় তরবারি দিয়া প্রতাপের ডান হাত কাটিয়া ফেলিলেন। প্রতাপ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

মানসিংহ প্রতাপকে বন্দী করিয়া দিল্লীর পথে রওনা হইলেন। কিন্তু পথে কাশীতে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হইল। বাঙ্গলার যশোরবি চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল। মানসিংহ বাঙ্গালীকে একটি বিদ্যা শিখাইয়া গেলেন, তাহা বাঙ্গালী ভোলে নাই। গুপ্তচর হইলে নিরাপদে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়, এবং প্রবলতম শত্রুও বশীভূত হয়। কচুরায় "যশোহর জিৎ" উপাধি লইয়া স্বাধীনে রাজ্যে মোগলের জমিদার হইলেন।

দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদ আলি।

(২)

মামিনা খাতুনের গর্ভে সুলতান সুলেমান শা কেরাণির দুইটি পুত্র হয়। প্রথমটির নাম দায়ুদ খাঁ, দ্বিতীয়টির নাম ঈশা খাঁ। দায়ুদ খাঁ মোগলদিগের সহিত লড়াই করিয়া পরাজিত এবং নিহত হওয়ার পরে, বাঙ্গলা দেশে পাঠানদিগের নেতৃত্বের ভার পড়ে ঈশা খাঁর উপরে। ঈশা খাঁর মতন বীরপুরুষ তখনকার দিনে বাঙ্গলা দেশে খুব কমই ছিল। ইনি বার ভুইয়াঁদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন।

দায়ুদের মৃত্যুর পর তিনি নিজেকে গৌড়ের সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিন বৎসর পরে তিনি দিল্লীতে কর পাঠান বন্ধ করিয়া দিলেন, আকবর ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ফৌজদার সাহবাজ খাঁর অধীনে বিস্তর সৈন্য বাঙ্গলা দেশে পাঠাইলেন। আকবরের হুকুম "যেমন করিয়া পার ঈশা খাঁর হাত পা শিকলে বাঁধিয়া দিল্লীতে লইয়া আইস।" বাঙ্গলায় ঈশা খাঁর সহিত সাহবাজ খাঁর তুমুল যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে ঈশা খাঁ পরাজিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন, পথে বন জঙ্গল নদনদী উত্তীর্ণ হইয়া তিনি অবশেষে চট্টগ্রাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চট্টগ্রাম

হইতে ঢাকায় আসিয়া তিনি জঙ্গলে রাত্রিযাপন করিলেন, চট্টগ্রাম হইতে তিনি সঙ্গে করিয়া কয়েকটি বিড়াল লইয়া আসিয়াছিলেন। ময়মনসিং জেলার একটা বনে আসিয়া ইন্দুরের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তিনি রাত্রে বিড়ালগুলি ছাড়িয়া দিলেন, সকালে আসিয়া তাঁহার অনুচরগণ খবর দিল যে ইন্দুর তাঁহার বিড়ালগুলি মারিয়া ফেলিয়াছে। ঈশা খাঁ খবর শুনিয়া বলিলেন যে "ইন্দুর বিড়াল মারিয়াছে এইরূপ অদ্ভুত খবর আমি কখনও শুনি নাই, যে যায়গায় অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, সেই যায়গাই আমার উপযুক্ত স্থান, আমি এইখানে আমার রাজধানী স্থাপন করিব।"

সেই জঙ্গলে রাম লক্ষণ বলিয়া দুইজন ভাই জমিদারি করিতেন, তাঁহারা কোচ জাতীয়। রাত্রি বেলায় যখন তাঁহারা রাজবাড়ীর ফটক বন্দ করিয়া ঘুমাইতেছিলেন তখন ঈশা খাঁ অনুচর লইয়া রাজবাড়ী আক্রমণ করিলেন, রাত্রি বেলায় চতুর্দ্দিকে গোলমাল শুনিয়া রাম লক্ষণ পলাইয়া গেলেন, তাঁহাদের খোজ আর পাওয়া যায় নাই। ঈশা খাঁ এখন হইতে এই প্রদেশটির স্বাধীন রাজা হইলেন, তিনি জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সেইখানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়া তাহার নাম জঙ্গলবাড়ী রাখিলেন। আগে যেখানে বাঘ ভালুক চরিয়া বেড়াইত এখন সেখানে সুরম্য প্রাসাদ উঠিল। জঙ্গলবাড়ীর সিংহাসনে বসিয়া ঈশা খাঁ কেমন

করিয়া তাঁহার রাজ্য বাড়াইবেন, সদা সর্ব্বদা তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তাহার সৈন্যদল ক্রমে খুব বড় হইল।

দিল্লীর সম্রাট আকবরের কাণে ঈশা খাঁর বিদ্রোহের কথা গেল। তিনি ঈশাখাঁকে দিল্লীতে আহ্বান করিবার জন্য তাঁহার কাছে দূত পাঠাইলেন। ঈশা খাঁ দূতের বুকে ভারী পাথর চাপাইয়া তাহাকে কয়েদখানায় ফেলিয়া রাখিলেন। এদিকে দিন যায়, মাস যায়, বৎসর ঘুরিয়া আসিল—আকবর তাহার দূতের কোন খবর পাইলেন না। তখন তাঁহার অধীনস্থ সর্ব্বাপেক্ষা সেরা বীর মানসিংহকে সৈন্যসামন্ত দিয়া বাঙ্গলা দেশে পাঠাইলেন। মানসিংহের সহিত বুকাই নামক স্থানে ঈশখাঁর প্রথম যুদ্ধ হয়, ঈশাখাঁ বুকাই হইতে হটিয়া সেরপুরে আসিলেন, সেরপুর হইতে দেওয়ানবাগ এবং দেওয়ানবাগ হইতে এক দুর্গ ছাড়িয়া অপর দুর্গে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মানসিংহের সহিত অতুল বিক্রমে লড়াই করিতে লাগিলেন; মানসিংহ দেখিলেন যে ঈশাখাঁর সহিত যুদ্ধে তাঁহার শুধু লোকক্ষয়ই হইতেছে, কোন ফল পাওয়া যাইতেছে না, তাহা দেখিয়া রাজপুতবীর পাঠানসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। কিন্তু তিনি নিজে দ্বন্দ্বযুদ্ধে না গিয়া তাঁহার জামাতাকে ঈশাখাঁর সহিত যুদ্ধে পাঠাইলেন, উভয় সৈন্যদলের সম্মুখে দুইবীরের মধ্যে অসিযুদ্ধ চলিতে লাগিল। ঈশা খাঁ

তেন যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মানসিংহ; কিন্তু যখন তরবারির

উভয় সৈন্যদলের সম্মুখে দুই বীরের অসিযুদ্ধ চলিতে লাগিল

পৃঃ ১০৪—বাঙ্গলায় বিদেশী।

খোঁচায় মানসিংহের জামাই নিহত হইল তখন পার্শ্ববর্ত্তী বীর মানসিংহ ঈশাখাঁর হাত ধরিয়া বলিলেন "বীর মানসিংহ নিহত হয় নাই, আমিই মানসিংহ, তুমি তোমার অপূর্ব্ব বীরত্বে আমার হৃদয় জয় করিয়াছ, আজ হইতে তুমি আমার দোস্ত।" ঈশা খাঁ যদিও সাহসে ও শৌর্য্যে অদ্বিতীয় ছিলেন কিন্তু তাঁহার মন অত্যন্ত কোমল ছিল; তিনি মানসিংহকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু হইলেন, উভয়পক্ষের সৈন্যদলের মধ্যে আনন্দের ধূম পড়িয়া গেল। যুদ্ধ সাজ ত্যাগ করিয়া প্রত্যেকে মনের খেয়ালে যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে মানসিংহের রাণীর সহিত ঈশাখাঁর বেগমসাহেবের খুব ভাব লইল।

মানসিংহের দিল্লী ফিরিবার সময় যখন সন্নিহিত হইল, তখন মানসিংহের রাণী ঈশাখাঁর পত্নীর কাছে বিদায় লইতে গেলেন, রাজপুত রাণীর বিমর্ষ মুখ দেখিয়া বেগমসাহেব তাঁহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মানসিংহের রাণী বলিলেন, "সখী আমাদিগকে দিল্লীতে ফিরিতে হইবে, কিন্তু বাদসাহের আদেশ ছিল যে ঈশাখাঁকে বাঁধিয়া দিল্লীতে আনিতে হইবে, তাহা না হইলে রাজার গর্দ্দান যাইবে। দিল্লীতে ফিরিয়া গেলে রাজার কি অবস্থা হইবে তাহা ভাবিয়া আমার মনে কোন শান্তি নাই।"

ঈশাখাঁর স্ত্রী স্বামীকে যখন এই কথা জানাইলেন তখন

তিনি বলিলেন, "বন্ধুর জন্য এমন কোন কাজ নাই যাহা আমি না করিতে পারি; আমি বন্দী হইয়া রাজা মানসিংহের সঙ্গে দিল্লীতে যাইব।"

রাজা মানসিংহ এই বীরের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগে মোহিত হইয়া শপথ করিলেন যে যতদিন তিনি জীবিত আছেন ততদিন কেহই ঈশাখাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না।

যথাসময়ে ঈশাখাঁকে সঙ্গে লইয়া মানসিংহ দিল্লীতে রওনা হইলেন, দিল্লীতে পঁহুছিয়া ঈশাখাঁকে হাত পা বাঁধিয়া বন্দীশালায় ফেলিয়া রাখা হইল। ঈশাখাঁর মতন এত বড় আশ্চর্য্য বীর বন্দী হইয়াছে—এইজন্য রাজসভায় মানসিংহের খুব আদর বাড়িল। এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া দিল্লীতে কয়েকদিন ধরিয়া আমোদ-প্রমোদ চলিতে লাগিল।

একদিন সম্রাট আকবর উচ্চপদস্থ রাজসভাসদগণ পরিবৃত হইয়া মানসিংহকে বাঙ্গলাদেশের যুদ্ধ কি রকম হইয়াছিল সে সম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মানসিংহ বলিলেন "খোদাবন্দ, আমি হুজুরের কৃপায় বিস্তর যুদ্ধ করিয়াছি এবং অসংখ্য বীরপুরুষ দেখিয়াছি, কিন্তু ঈশাখাঁর মতন সাহসী বীর এ পর্য্যন্ত আমি দেখি নাই। এই বীর এখন অনাহারে সাধারণ কয়েদীর মতন বন্দীশালায় আছেন। যদি সম্রাট ইঁহার সঙ্গে মিষ্ট ব্যবহার করেন তাহা হইলে চিরকাল ঈশাখাঁ সম্রাটের কেনা গোলাম হইয়া থাকিবে।

কিন্তু যদি কোন উপায়ে ঈশাখাঁ পলাইয়া যায়, তাহা হইলে সাবধান এত বড় বীরকে যুদ্ধে পরাজয় করা অসম্ভব হইবে।"

আকবর সা মানীর মান জানিতেন, তিনি মানসিংহের কথা শুনিয়া বন্দীশালায় গিয়া নিজের হাতে ঈশাখাঁর শিকল খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "বীর তোমার এইরূপ দশা দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি—তোমার উপরে এই নির্দ্দয় ব্যবহারের আমি অনুতপ্ত আছি। আমি তোমাকে এখনই বন্দীশালা হইতে মুক্তি দিলাম।"

হিন্দুস্থানের মালিক শাহেন শাহ আকবর বাদশাহের মুখে এই কথা শুনিয়া ঈশাখাঁর মন গলিয়া গেল, তিনি সম্রাটের পায়ের উপর পড়িয়া লুটাইয়া তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন, সম্রাট তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানজনক স্থানে বসাইলেন, আকবর তাঁহাকে মসনদ আলি উপাধি দিয়া পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ জমিদারী দিয়া বাঙ্গলা দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

ঈশাখাঁ ও কেদার রায়।

(৩)

অর্দ্ধেক বাঙ্গলার জমিদারী পাইয়া ঈশাখাঁ মসনদ আলি কোশা নৌকা করিয়া বাঙ্গলার দিকে রওনা হইলেন। নৌকার

মধ্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নৌকা, কোশা নৌকা, এ যেন একটা প্রকাণ্ড রাজবাড়ী পাল তুলিয়া নদীর বুকের উপর দিয়া চলে। যমুনা দিয়া গঙ্গায় আসিয়া নদীর স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে নৌকা হিন্দুস্থানের অপূর্ব্ব শ্রী এবং সম্পদের মধ্য দিয়া ভাসিতে ভাসিতে ঈশাখাঁ সোণার বাঙ্গলায় আসিয়া পঁহুছিলেন; তাহার পরে পদ্মা দিয়া নৌকা তীরের মতন ছুটিতে ছুটিতে বিক্রমপুরস্থিত শ্রীপুরের ঘাটে আসিয়া ঈশাখাঁ নৌকা থামাইলেন। শ্রীপুর বাঙ্গলার অন্যতম দুইটি বারভূঁইয়া কেদার রায় চাঁদ রায়ের রাজধানী; শ্রীপুর তখন পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী নগর ছিল, চাঁদরায় ও কেদাররায়ের প্রতাপে তখন বাঙ্গলা দেশ কাঁপিত।

ঈশাখাঁ জাহাজ হইতে দেখিলেন যে একটি ত্রিতল প্রাসাদের ছাদের উপর কয়েকটি যুবতী স্ত্রীলোক হাস্য কৌতুকের সহিত খেলা করিতেছেন। যুবতীর রূপের ছটায় ছাদটা আলোকিত হইয়াছে। কোশা নৌকা দেখিয়া সুন্দরী খেলা ছাড়িয়া নৌকার দিকে তাকাইলেন। ঈশাখাঁ দাঁড়াইয়াছিলেন, চারি চক্ষের মিলন হইল, উভয়েই উভয়ের রূপে মুগ্ধ হইলেন, যুবতীর খেলা গেল, তিনি অন্যমনস্ক হইয়া শুধু নৌকার আরোহীর কথা ভাবিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময়ে যখন রাজকন্যা সখীদের সহিত গা ধুইতে স্নানের ঘাটে নামিলেন, তখন গোপনে একটি চিঠি একটি সোলার মধ্যে ভরিয়া তাঁহার প্রেমিকের দিকে

ইঙ্গিত করিয়া জলে ভাসাইয়া দিলেন, স্নান শেষ হইবার পর যখন সুন্দরী বাড়ীতে চলিয়া গেলেন তখন ঈশাখাঁ জল হইতে সোলা তুলিয়া লইয়া তাহার মধ্য গোপন চিঠিখানি পড়িলেন, চিঠিখানিতে লেখা ছিল :—

"হে অপরিচিত, আমার হৃদয় আমি তোমাকে সমর্পণ করিয়াছি। আমি ধর্ম্ম জানি না, আমি সমাজ মানি না তোমাকে পাইলেই আমার সমস্তজীবন আমি সার্থক মনে করিব। আমার উপরে যদি তোমার কোন দয়া থাকে তাহা হইলে চৈত্রমাসের শুক্লা অষ্টমীতে তুমি সৈন্য সামন্ত লইয়া স্নানের ঘাটে আসিও, আমি সেইদিন স্নানের জন্য যখন ঘাটে আসিব তখন তুমি আমাকে জোর করিয়া লইয়া যাইও, তোমার কোশানৌকা তীরবেগে ছুটিয়া যাইবে, আমাদিগকে কেহই ধরিতে পারিবে না।"

ঈশাখাঁ প্রফুল্ল অন্তরে জঙ্গলবাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন, এবং চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে নৌকা লইয়া পদ্মার ঘাটের কাছে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ঘাটের কাছে পদ্মার মধ্যে বাঁশের বেড়া লাগাইয়া খানিকটা যায়গা রাজকন্যার স্নানের উপযোগী করা হইয়াছিল, স্নানের সময়ে রাজকন্যা সখীদিগকে লইয়া জলে নামিলেন, ঈশাখাঁ অমনি জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বাঁশের বেড়া ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে লইয়া সাঁতার কাটিয়া নিজের জাহাজে আসিয়া জাহাজ ছাড়িয়া দিলেন।

এই রাজকন্যার ভাল নাম সুভদ্রা, ডাক নাম সোনামুখি ইনি কেদাররায়ের ভগিনী, তখন কেদাররায়ের মতন প্রতাপশালী লোক পূর্ব্ববঙ্গে খুব কমই ছিল, তাঁহার ভগিনীকে মুসলমানে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে খবর পাইয়া তিনি তাহার নৌকা সাজাইয়া ঈশাখাঁর জাহাজের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিলেন, কিন্তু অনুকূল বায়ুতে ঈশাখাঁর নৌকা তাহার নৌকা ছাড়াইয়া গেল। যখন তিনি দেখিলেন যে ঈশাখাঁকে ধরা তাঁহার অসম্ভব তখন তিনি ভগবানের নাম লইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"দুরাত্মা, এমন সহর বাঙ্গলা দেশে নাই যাহা আমার প্রতিহিংসার হাত হইতে তোমাকে উদ্ধার করিবে। তোমার অপমান আমি কখনই ভুলিব না, তোমাকে যদি আমি কখনও ধরিতে পারি তাহা হইলে পদাঘাতে তোমার মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ করিব। তোমাকে যদি আমি ধরিতে না পারি তাহা হইলে তোমার পুত্র সন্তানকে মারিয়া আমি এই অপমানের প্রতিশোধ নিব।" ঈশাখাঁ ও সুভদ্রার কাণে কেদাররায়ের এই ভীষণ কথাগুলি গেল. সুভদ্রা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিয়া তাঁহার প্রাণনাথকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইলেন।

জঙ্গলবাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া মহাধুমধামের সহিত সুভদ্রার সঙ্গে ঈশাখাঁর বিবাহ হইল। মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিবার পর সুভদ্রার নাম নিয়ামতজান হইল। ঈশাখাঁ সমস্ত প্রাণমন

ঢালিয়া সুভদ্রাকে ভালবাসিতেন এবং সুভদ্রাও সেই ভালবাসার প্রতিদান দিয়াছিলেন, উভয়েই রাত্রিদিন পরস্পরের কাছাকাছি থাকিতেন। কিন্তু কালের নিয়ম অনুসারে দীর্ঘকালের পরে ঈশাখাঁ দেহত্যাগ করিলেন। সুভদ্রার গর্ভে ঈশাখাঁর দুইটি চাঁদের মতন পুত্রের জন্ম হয়, একজনের নাম আদম খাঁ মসনদ আলি অপরটির নাম বিরাম। আদমের যখন পনেরো বৎসর বয়স তখন ঈশাখাঁর মৃত্যু হয়।

যতদিন ঈশাখাঁ জীবিত ছিলেন ততদিন কেদার রায় তাঁহার কিছু করিতে পারেন নাই। ঈশাখাঁর মৃত্যুর পর কেদার রায় লোকজন সঙ্গে লইয়া নৌকা করিয়া জঙ্গলবাড়ীতে আসিয়া তাঁহার ভগিনীর সঙ্গে দেখা করিলেন। ভাইকে দেখিয়া শত দুঃখের মধ্যেও বিধবার আনন্দ হইল, তিনি তাঁহাকে যথাসাধ্য আদর যত্ন করিতে লাগিলেন। একদিন নিরালা তিনি সুভদ্রাকে বলিলেন, "বোন তুমি এতদিন সুখে সচ্ছন্দে ছিলে জানিয়া যে আমি কত আনন্দিত ছিলাম তাহা তোমাকে বলিতে পারি না, আমার ইচ্ছা ছিল তোমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করি কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠে নাই। তোমার চাঁদের মতন দুইটি ছেলে আছে, আমার বড় ইচ্ছা যে তাহাদের সহিত আমার দুইটি মেয়ের বিবাহ দিই। তুমি তাহাদিগকে আমার সহিত শ্রীপুরে পাঠাইয়া দাও, সেখানে গিয়া আমি তাহাদিগের সহিত আমার দুইটি মেয়ের বিয়ে

দিয়া তোমার বুকের মাণিক দুটিকে তাদের উভয়ের সঙ্গে পুনরায় পাঠাইয়া দিব। তাহা ছাড়া তারা গেলে আমাদের মা ও অত্যন্ত খুসী হইবেন।" সুভদ্রা বলিলেন "ভাই, আমাদের এখানকার নিয়ম যে জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানরা শ্বশুর বাড়ীতে বিয়ে করে না, এখানে কনে লইয়া আসিলে বিবাহ হইতে পারে।"

একদিন কেদার রায় জঙ্গলবাড়ীর সমস্ত আত্মীয় কুটুম্ব এবং তাঁহার দুই ভাগিনেয়কে তাঁহার নৌকাতে নিমন্ত্রণ করিলেন, রাত্রিবেলায় সকলের খাওয়া দাওয়া হইলে সকলে বাড়ীতে চলিয়া আসিল, নৌকাতে শুধু আদম এবং বিরাম রহিল, রাত হইয়াছে, তাঁহারা মায়ের কাছে যাইবার জন্য কেদার রায়ের কাছে বিদায় চাহিলেন, কিন্তু কেদার রায় বলিলেন, "আজ রাতটা তোমরা আমার কাছে থাক, কালই আমি চলিয়া যাইব, মার কাছেই ত তোমরা বরাবর থাকিবে।" কেদাররায়ের অনুরোধে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা নৌকাতে রহিয়া গেলেন। রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হইয়া আসিল, দুইটি ভাইএর চোখ ঢুলিয়া পড়িল, ক্রমে তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িলেন। কেদাররায় তখন তাঁহার নৌকা ছাড়িয়া দিলেন, নৌকা অনুকূল স্রোতে সোঁ সোঁ করিয়া চলিতে লাগিল, সকাল হইলে যখন দুইটি কুমারের ঘুম ভাঙ্গিল তখন তাঁহারা দেখিলেন যে তাঁহারা জঙ্গলবাড়ী ছাড়িয়া অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের মামার পা জড়াইয়া

দুইটী রাজকন্যা......কারাগারের ফটকের কাছে দাঁড়াইলেন

পৃঃ ১১৩—বাঙ্গলায় বিদেশী।

কাঁদিতে লাগিলেন, "আমাদের দুঃখিনী মা আমাদের পথ চাহিয়া রহিয়াছেন, আমাদের ছাড়িয়া দিন, আমরা আমাদের মার কাছে যাই।" কিন্তু কেদাররায়ের নির্ম্মম অন্তঃকরণ এই দুইটি বালকের ক্রন্দনে কোমল হইল না। শ্রীপুরে পৌঁছিয়া এই সুকুমার বালক দুইটিকে লোহার শিকলে বাঁধিয়া তাঁহাদের বুকের উপর বিশ সের ও মনের পাথর চাপাইয়া কারাগারে ফেলিয়া রাখিলেন। কালীপূজার সময়ে কালীর কাছে আদম এবং বিরামকে বলি দিবেন এই স্থির করিলেন।

কেদাররায়ের পরমা সুন্দরী দুইটি কন্যা ছিল—তাঁহাদের সহিত বিবাহ দিবার অছিলা করিয়া আদম এবং বিরামকে শ্রীপুরে আনিয়া কয়েদে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন একথা তাহারা শুনিতে পাইয়াছিল।

যখন নিশুতি রাত তখন দুইটি রাজকন্যা সোনার থালিতে নানা রকমের খাবার সাজাইয়া কারাগারের ফটকের কাছে আসিলেন। প্রহরীরা তাঁহাদিগকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল। তাঁহারা দুই কুমারের হাত হইতে শিকল খুলিয়া, বুক হইতে পাথর সরাইয়া দিয়া তাঁহাদের সম্মুখে খাবারের থালি হাতে করিয়া দাঁড়াইলেন। "ইঁহারা কি পরী, স্বর্গ হইতে তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য নামিয়া আসিয়াছেন! মানুষের দেহে কি এত রূপ সম্ভবে?" তাঁহাদের মনের কথা বুঝিতে পারিয়া জ্যেষ্ঠা কন্যা ধীরে ধীরে

বলিলেন, আমরা দুটি কেদার রায়ের কন্যা, আমাদের সঙ্গে বিবাহ দিবার জন্য মহারাজ আপনাদিগকে এখানে আনিয়াছেন, আমরা আপনাদের বাগদত্তা পত্নী—পিতার কথার আমরা অসম্মান করিব না; আপনারা আমাদের ইহকাল এবং পরকালের আশ্রয়, আমরা নিজেদের হাতে রাঁধিয়া আপনাদের জন্য খাবার আনিয়াছি, আপনারা আহার করিয়া সুস্থ হইয়া উঠুন, তাহা হইলে আমাদের সমস্ত শ্রম আমরা সার্থক মনে করিব। তখন আদম বলিলেন "কুমারী, আপনাদের সহিত আমাদের সকলের সম্মুখেই বিবাহ হইবে, বিবাহের পরে আপনাদের হাতের রান্না আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই খাইব, কিন্তু আজ নয়, আজ আপনারা ফিরিয়া যান।" রাজকন্যারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেলেন।

এদিকে সকাল বেলায় সুভদ্রা দুই রাজকুমারের খবর লইয়া জানিতে পারিলেন যে কেদার রায় তাঁহার নয়নের দুইটি মণিকে লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। তখন তাঁহার মনে কেদার রায়ের শপথের কথা মনে পড়িল। কাঁদিয়া কাটিয়া সময় নষ্ট করিয়া ঈশা খাঁর বেগম, ঈশা খাঁর সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী করিমুল্লাকে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহার বিপদের কথা বলিলেন। করিমুল্লা সকল কথা শুনিয়া, বলিলেন "রাণীমা আপনার চিন্তার কোন কারণ নাই, এই দাসের দেহেতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত একবিন্দু রক্ত আছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান বংশের কেহই কোন অপকার করিতে পারিবে না।"

করিমুল্লা শ্রীপুরের দিকে রওনা হইলেন। শ্রীপুরে তখন পথে ঘাটে সকলেই আদম এবং এবং বিরামের কথা বলিত। সকলেই তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিত। তাঁহাদের কাছ হইতে করিমুল্লা কুমার দুইটির সকল খবরই পাইলেন।

তখনকার দিনে করিমুল্লার মতন শক্তিশালী লোক খুবই কম ছিল, তাঁহার গায়ে ভীমের মতন জোর ছিল, ভীমের মতন তিনি সদা সর্ব্বদা গদা লইয়া চলিতেন। সেই গদা লইয়া প্রলয়ের শিবের মতন মূর্ত্তিমান ধ্বংসের মতন শ্রীপুরে পৌছিয়া যাহাকে তাহাকে মারিয়া ফেলিতে লাগিলেন। অবশেষে কেদার রায় খবর পাইয়া করিমুল্লাকে ধরিয়া আনিবার জন্য এক প্রকাণ্ড সৈন্যদল পাঠাইলেন, এতবড় সৈন্যদলের সঙ্গে একা লড়াই করা অসম্ভব দেখিয়া করিমুল্লা পদ্মাতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং তিন ডুবে পদ্মা পার হইয়া ওপারে গিয়া উঠিলেন। ওপারে সাধন বলিয়া একজন অবস্থাপন্ন মাঝি বাস করিত, রাত্রিবেলায় গিয়া তিনি নিজের পরিচয় দিয়া তাহার বাড়ীতে উঠিলেন। সেখানে একমণ চিঁড়া, পনেরো সের চিনি, দুই মণ দই এবং একসের লবণ গলাধঃকরণ করিয়া সাধনকে সঙ্গে লইয়া তাহার নৌকাতে উঠিলেন, একদিনেই নৌকা জঙ্গলবাড়ী পৌছিল।

দশদিন পরে সৈন্য সামন্ত লইয়া কোশা জাহাজে চড়িয়া করিমুল্লা শ্রীপুরে আসিয়া পৌছিলেন, "মার মার" শব্দে তাঁহারা রাজবাড়ীর

উপরে পড়িয়া রাজবাড়ীর সমস্ত প্রহরীকে মারিয়া ফেলিলেন। প্রাসাদের ছাদে চড়িয়া শত্রুর সৈন্য সংখ্যা দেখিয়া কেদার রায় বুঝিতে পারিলেন যে ইহাদের সহিত লড়াই করিবার মতন শক্তি তাঁহার নাই, ইহার মধ্যে যদি আদম এবং বিরামকে কালীর কাছে বলি দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় ভাবিয়া তিনি তাঁহার সৈন্যদিগকে হুকুম দিলেন,—"আজই এই দুইজনকে কালীর কাছে বলি দাও।" প্রহরীরা দুইটি কুমারের হাত বাঁধিয়া কালীর মন্দিরে লইয়া চলিল।

এদিকে দুই রাজকুমারী এই খবর পাইয়া হাতে খড়্গ লইয়া পাগলিনীর মতন কালীমন্দিরে ছুটিয়া গেলেন, সেখানে গিয়া দেখিলেন যে কাঠ গড়াতে দুই কুমারকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে, একজন লোক বসিয়া পাথরে খড়্গের শান দিতেছে। রাজকুমারীর মধ্যে একজন একমুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া তরবারির এক ঘায়ে তাহার মুণ্ডপাত করিলেন, আর একজন রাজকন্যা মন্দিরের আর একটি চাকরকে মারিয়া ফেলিলেন, আর যাহারা ছিল তাহারা মন্দির ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। তখন রাজকুমারীরা তাঁহাদের ভাবী স্বামীর বাঁধন খুলিয়া দিলেন।

এদিকে জঙ্গলবাড়ীর সৈন্য সামন্তরা শ্রীপুরে আগুন লাগাইয়া দিল। কিন্তু করিমুল্লা কেদার রায়কে কোথায়ও দেখিতে পাইলেন না, তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে কেদার রায়কে যদি তিনি

ফেলিয়া যান তাহা হইলে এই দুষ্ট লোকটি আবার কোন অপকার করিতে পারে।

এই সময়ে রাজকুমারীরা কুমার দুইটিকে লইয়া করিমুল্লার কাছে আসিলেন। করিমুল্লা আনন্দে অধীর হইয়া আদম এবং বিরামকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দাশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তখন রাজকুমারী দুইটি করিমকে বলিলেন, শত্রুকে বিনাশ না করিলে আমাদের কোন মঙ্গল নাই, তিনি যদি বাঁচিয়া থাকেন তাহা হইলে যে কোন না কোন উপায়ে তিনি আমাদের উপরে প্রতিশোধ লইবেন। রাজপ্রাসাদ আক্রান্ত হইলে তিনি কখনও সেখানে থাকেন না। শ্রীপুরের পাঁচরশি দূরে খসনা বলে একটি বন আছে, সেই বনের নীচে তাঁহার একটি সুন্দর বাড়ী আছে. এই বাড়ীটীর নয়টী ফটক, বাড়ীর মাঝখানে একটী প্রকাণ্ড ঘর আছে, সেই ঘরে তিনি এখন নিদ্রিত। একটা সুড়ঙ্গ দিয়া এই বাড়ীর সহিত পদ্মা নদীর যোগ আছে, করিমুল্লা এই সংবাদ পাইয়া খসনায় আসিয়া দক্ষিণদিকের ফটক দিয়া কেদার রায়ের গুপ্ত প্রাসাদের মধ্যে ঢুকিয়া কেদার রায়কে সুপ্ত অবস্থায় মাঝখানের বড় ঘরে দেখিতে পাইলেন। ঘুমন্ত অবস্থায় শত্রুকে হত্যা করা বীরের কাজ নয় বলিয়া তিনি সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন, ঘুম হইতে জাগিয়া তিনি তরবারি হাতে করিবার আগেই করিম তাঁহার প্রকাণ্ড গদার আঘাতে কেদার রায়ের মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর রাজকুমার এবং রাজ-

কুমারী দুইটিকে লইয়া করিম জঙ্গলবাড়ীতে ফিরিলেন, সেইদিন জঙ্গলবাড়ীতে আনন্দের রোল পড়িয়া গেল।

আদম এবং বিরামের সহিত কেদার রায়ের মেয়ের বিবাহ হইল, মুসলমানদের বিবাহের রীতি অনুসারে যখন উকীল তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহারা স্বেচ্ছায় আদম এবং বিরামকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন কিনা, তখন তাঁহারা তাঁহাদের সম্মতি জানাইলেন। তাঁহাদের অপেক্ষা আর কোন কুমারী জগতে স্বামী লাভের জন্য এত দুঃখ কষ্ট এবং নির্ম্মমতা বরণ করেন নাই।

বলা বাহুল্য যে এই কাহিনীটি একটি গ্রাম্য গাঁথা হইতে গ্রথিত, ইতিহাসের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। বারভূঁইয়ার শ্রেষ্ঠ বীর কেদার মোগলের সহিত যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

রাজা সীতারাম রায়

"ধন্য রাজা সীতারাম বাঙ্গলা বাহাদুর,
যার বলেতে চুরি ডাকাতী হয়ে গেল দূর।
এখন বাঘে মানুষে একই ঘাটে সুখে জল খাবে,
এখন রামী শ্যামী পোঁটলা বেঁধে গঙ্গাস্নানে যাবে॥

রাজা সীতারাম বারভুঁইয়াদের মধ্যে একজন নহে, কারণ বাঙ্গলার দ্বাদশ ভৌমিক পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন; তাঁহারা আকবর শা এবং জাহাঙ্গীর বাদশার সময়ের লোক ছিলেন। কিন্তু রাজা সীতারাম আওরেঙ্গজেবের সময়ের লোক; সেইজন্য তিনি বারভুঁইয়া নন, কিন্তু ইনি প্রতাপাদিত্য কিংবা ঈশা খাঁর মতনই প্রবল প্রতিপত্তিশালী বাঙ্গালার জমিদার ছিলেন, এবং ইঁহাদের মতন ইনিও মোগল ফৌজের সঙ্গে লড়াই করেন। অবশেষে প্রতাপাদিত্যের মতনই ইনি বাঙ্গালার হিংসাপরায়ণ জমিদারদিগের দ্বারা পরিপুষ্ট বাঙ্গলার নবাব সৈন্যের হাতে পরাজিত, বন্দী এবং অবশেষে নিহত হন।

সীতারাম ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে ভূষণার উদয় নারায়ণের ঘরে জন্মলাভ করেন। অল্প বয়সে আরবী, পার্শী এবং সামরিক বিদ্যা অধিকতর মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করেন। বাঙ্গলার অমর কবি চণ্ডীদাস এবং জয়দেবের গান ইঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। মহম্মদ-আলী নামক একজন ফকির ইঁহার শিক্ষক ছিলেন। সীতারাম ইঁহাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন এবং পরিশেষে ইঁহারই নামে তাঁহার নূতন রাজধানীর নাম মহম্মদপুর রাখিয়াছিলেন।

বাঙ্গালায় তখন সায়েস্তা খাঁ নবাব, পাঠান করিম খাঁ বিদ্রোহী হইয়া সায়েস্তা খাঁর অধীনস্থ সেনাপতিদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সীতারামকে তখন কেহই

চিনিত না, তিনি গর্ব্ব করিয়া বলিলেন যে উপযুক্ত সৈন্য পাইলে তিনি বিদ্রোহ দমন করিতে পারেন। সায়েস্তা খাঁর কানে এ কথাটা গেলে তিনি সীতারামের অধীনে সৈন্য সামন্ত দিয়া তাঁহাকে করিম খাঁর বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। সীতারাম করিম খাঁকে যুদ্ধে পরাজিত এবং নিহত করিলেন। তাঁহার সমস্ত দুর্গ এবং ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া যখন সীতারাম নবাবের কাছে ফিরিয়া আসিলেন তখন খুসী হইয়া তিনি তাঁহাকে চাক্‌লা ভূষণার অন্তর্গত নলদী পরগণা জায়গীর এবং রায় রায়াণ উপাধি দান করিলেন।

তাঁহার নূতন জমিদারীতে আসিবার পথে তাঁহার সহিত একটি দস্যুদলের লড়াই হয়, যুদ্ধে দস্যুদলটি হারিয়া যায় এবং তাহাদের দলপতি বক্তার সীতারামের সাহসে এবং উদারতায় মুগ্ধ হইয়া দস্যু-ব্যবসা চিরদিনের জন্য ছাড়িয়া দিয়া সীতারামের অনুবর্ত্তী হয়।

সীতারাম তাঁহার নূতন জমিদারীতে আসিয়া কালীগঙ্গার তীরে হরিহরনগর নামে একটি প্রকাণ্ড নগর প্রতিষ্ঠা করিলেন। মহম্মদ-পুর তাঁহার জায়গীরের রাজধানী হইল। ভূষণার ফৌজদার আবু তোরাপ তাঁহার সদ্‌গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার বন্ধু হইলেন এবং তাঁহার কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিলেন।

এই অঞ্চলে দস্যুদিগের যন্ত্রণায় কেহ থাকিতে পারিত না। বক্তারের সাহায্যে তিনি বারোটি দস্যুদলকে দমন করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিলেন, বাছাই করিয়া তিনি দস্যুদলের মধ্য হইতে

দস্যুদলপতি..... সীতারামের অনুবর্ত্তী হয়

পৃঃ ১২০—বাঙ্গলায় বিদেশী

উপযুক্ত লোকদিগকে লইয়া তাঁহার সৈন্যদল পুষ্ট করিলেন। কিন্তু দস্যু-দলন এবং দেশে শান্তি স্থাপন করিয়া তিনি যেমন নবাবের প্রীতিভাজন হইলেন, তেমনি আবার ফৌজদার তাঁহার শত্রু হইলেন।

তিনি সুযোগ্য কর্ম্মচারী দেশে রাখিয়া ফৌজদারের অনুমতি লইয়া গয়ায় পিতার পিণ্ডদান করিতে গেলেন এবং গয়া হইতে সন্ন্যাসীর বেশ লইয়া দিল্লীতে রওনা হইলেন। বাদশা আওরাঙ্গজেব সায়েস্তা খাঁর চিঠিতে রাজা সীতারামের প্রশংসা শুনিয়াছিলেন, তিনি সীতারামকে দেখিয়া তাঁহার খুব খাতির করিলেন। তাঁহাকে রাজা উপাধি এবং নিম্নবঙ্গে সুনিয়ম সুশৃঙ্খলা এবং প্রজাপত্তনের অধিকার দিলেন।

সীতারামের সুশাসন এবং প্রজাবাৎসল্যে দেশ বিদেশ হইতে হিন্দু ও মুসলমান অনেকেই আসিয়া তাঁহার জাইগীরে বসবাস করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই মহম্মদপুর ধনে-জনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শেষে আর নগরে লোক ধরে না—বহুগ্রাম জুরিয়া উপকণ্ঠ সৃষ্ট হইতে লাগিল।

দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিয়া সীতারাম উপযুক্ত সৈন্য গঠনে মনোযোগ দিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ অধিকাংশই নমঃশূদ্র জাতীয় ছিল, তাহারা অবসর সময়ে পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি সরকারী অনেক কাজই করিত, যুদ্ধের সময়ে সড়কি, ধনুর্ব্বান, অসি ও গুলাল বাঁশ লইয়া যুদ্ধ করিত। সীতারামের হিন্দু ও মুসলমানের

উপরে সম্প্রীতি ছিল, তিনি যেমন হিন্দুর জন্য দেবালয় তেমনি মুসলমানের জন্য মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিতেন। পার্শ্ববর্ত্তী অনেক পরগণার জমিদারদিগের নিকট তিনি অনেক জায়গা জমি কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার জমিদারী যশোহর, নদীয়া, খুলনা, ফরিদপুর এবং বরিশালের কিয়দংশ ব্যাপক ছিল।

বাঙ্গালার জমিদারবর্গ এবং ভূষণার ফৌজদার আবু-তোরাপ সীতারামের সৌভাগ্যে এবং সমৃদ্ধিতে হিংসায় মনে মনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে ছিলেন। যদিও বাদসাহের এবং নবাবের সনন্দে তাঁহার কাছ হইতে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত রাজকর প্রাপ্য ছিল না, তথাপি বারংবার রাজকরের জন্য ফৌজদার তাঁহাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। খাজনা চাহিয়া আবু-তোরাপ তাঁহাকে লোক পাঠাইয়া রাজ সভাতেই তাঁহাকে অপমান করিলেন। ফৌজদারের দূত চলিয়া গেলে সীতারাম উত্যক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আবু তোরাপের কাটামুণ্ডের দাম দশহাজার টাকা।"

মেনাহাতী সীতারামের বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন, তিনি এই কথা শুনিয়াই ভূষণার ফৌজদারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন, যুদ্ধে ফৌজদার পরাজিত এবং নিহত হইলেন।

আবু তোরাপ নবাবের জামাই ছিলেন। নবাব সীতারামের এই ব্যবহার ক্ষমা করিতে পারিলেন না। তিনি সীতারামকে দমন করিতে মনস্থ করিলেন। চতুর্দ্দিকে সাজ-সাজ রব পড়িয়া গেল। সীতারামও

আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বাঙ্গলার জমিদারবর্গ এখন সীতারামকে জব্দ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। দিল্লী হইতে বক্সআলি খাঁ ভূষণার ফৌজদারের পদে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন, ভূষণার মুসলমান সৈন্যের সহিত সীতারামের দুইবার যুদ্ধ হয়, দুইটি যুদ্ধে বক্সআলি খাঁ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন।

মুর্শিদাবাদে খবর গেল। আবার প্রকাণ্ড বড় মুসলমান সৈন্য বাঙ্গলার জমিদারদিগের সাহায্যে সীতারামের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল। তুমুলযুদ্ধ হইল—সীতারাম মুসলমানদিগকে আবার পরাজিত করিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁহার প্রচুর বলক্ষয় হইয়াছিল।

জমিদারবর্গ তাঁহার বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া লাগিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদ এবং ঢাকা হইতে আবার নবাব সৈন্য আসিয়া মহম্মদপুর ঘিরিয়া ফেলিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সীতারামের একটিমাত্র বিশ্বস্ত সেনা-পতি জীবিত ছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি প্রাণপণ লড়াই করিলেন। কেথিত আছে তাঁহার রাণী তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া কামান দাগিয়া-ছিলেন; কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার সৈন্য ধ্বংশ হইতে লাগিল, তাঁহার সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া গেল, অবশেষে মুসলমানগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিয় বন্দী করিয়া ফেলিলেন। বন্দী অবস্থায় মুর্শিদাবাদে পৌছিয়া রাজা সীতারাম বেশীদিন বাঁচেন নাই। সীতারামই বাঙ্গলার ভূম্যধিকারিদিগের মধ্যে শেষ জমিদার যিনি প্রবল প্রতাপান্বিত মোগলদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে সাহসী হইয়াছিলেন।

বাঙ্গলায় ইংরাজ বণিকদিগের আবির্ভাব এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান

আকবর যখন হিন্দুস্থানের মালিক তখন রাণী এলিজাবেথ ইংলণ্ডেশ্বরী। তাঁহার রাজত্বের শেষ ভাগে একটি কোম্পানী এসিয়ায় বাণিজ্য করিবার এক-চেটিয়া অধিকার লাভ করে।

তখন ভারতের উপকূলে পর্টুগীজদিগের পূর্ণ প্রভাব। পর্টুগীজ জাতি যখন স্পেইন দেশের রাজার অধীনস্থ হইল তখন ইহারা ইংলণ্ডের শত্রুরূপে পরিগণিত হইল। পর্টুগীজগণ ভারত হইতে বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া উচ্চ মূল্যে ইয়োরোপে বিক্রয় করিত, তাহারা ভারত সাগরে ইংলণ্ডের বাণিজ্য তরীর আবির্ভাবকে সুনজরে দেখিত না। কিন্তু ইংরাজদিগের সহিত কয়েকটি নৌ-যুদ্ধে তাঁহারা পরাজিত হইল। অবশেষে যখন ইংলণ্ডের সাহায্যে পর্টুগাল দেশ স্পেইনের হাত হইতে উদ্ধার হইল, তখন ইংরাজদিগের আর তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বীর চক্ষে দেখিল না। কিন্তু ভারত মহাসাগরে যাহাদের শত্রুতায় ইংরাজগণ বিশেষ ভাবে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল তাহারা হইল ইংলণ্ডের সন্নিকটবর্ত্তী হলাণ্ড দেশের লোক, ইহারা যাহাতে মলয় দ্বীপ পুঞ্জের সহিত একচেটিয়া ব্যবসা স্থাপন করিতে না পারে, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ভারতের পশ্চিম উপকূলে সুরাট বন্দরে তাহারা তাহাদের সর্ব্ব প্রথম কেন্দ্র

প্রতিষ্ঠা করিলেন, ভারতের পূর্ব্ব উপকূলে মসলিপত্তনে আর একটি কুঠি স্থাপিত হইল। এমন করিয়া ক্রমশঃ তাঁহাদের ব্যবসা ভারতবর্ষে বাড়িতে লাগিল। মস্‌লিপত্তন হইতে ২৩০ মাইল দক্ষিণে চন্দ্রগিরির হিন্দু রাজার নিকট হইতে বর্ত্তমান মান্দ্রাজ নগরী যেখানে অবস্থিত তাহা কিনিয়া সেখানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি পাইলেন। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর হাতে বোম্বাই আসিল। পর্টুগালের রাজকন্যা বিবাহ করিয়া ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস যৌতুক স্বরূপ বোম্বাই বন্দর পাইলেন। ১৫০ টাকা বার্ষিক খাজনা লইয়া এই অমূল্য স্থানটি তিনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দান করিলেন।

বাঙ্গলা দেশে নবাব সায়েস্তা খাঁর আমলে হুগলী, কাশিমবাজার, ঢাকায় ইংরাজদের কুঠী ছিল, বিহারে পাটনায় ও তাহাদের আস্তানা ছিল। কিন্তু সায়েস্তা খাঁ ইংরাজদিগকে সুনজরে দেখেন নাই, তিনি প্রথম হইতে ইংরাজদিগকে বাঙ্গলা দেশ হইতে উচ্ছেদ করিতে মনস্থ করিলেন। বাঙ্গলা দেশ হইতে তাঁহারা সোরা চালান দিতেন, এবং তাহার বদলে সোণা আমদানী করিতেন। সায়েস্তা খাঁ ইংরাজদিগের নিকট হইতে বাৎসরিক ৩০০০ টাকা লইয়া তাহাদের ব্যবসা করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। বাঙ্গলার কুঠির ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা মাদ্রাজের ইংরাজ শাসন-কর্ত্তার অধীনে ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে নবাব সায়েস্তা খাঁ ইংরাজ বণিকদিগের সহিত

সদ্ব্যবহার করিতেছেন না, তাই দেখিয়া তিনি স্থির করিলেন যে বাঙ্গলা দেশ হইতে ইংরাজদের ব্যবসা বাণিজ্য উঠাইয়া দিবেন। এই সময়ে এই দেশে দিনেমার এবং ফরাসী বণিকগণ ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপে দেখা দিলেন। আওরেঙ্গজেব অ-মুসলমানদের নিকট হইতে জেজিয়া আদায়ের আদেশ দিয়াছিলেন, নবাব সায়েস্তা খাঁ সম্রাটের আদেশ অনুসারে ইংরাজদিগের নিকট হইতে এই নূতন কর চাহিলেন। ইংরাজগণ প্রথমতঃ এই কর দিতে অস্বীকার করিয়া পরে সম্রাটকে নানা রকম উপহার পাঠাইয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি করিলেন। এদিকে বিলাতে কোম্পানীর পরিচালক বাঙ্গলা দেশে বিভিন্ন স্থানীয় কুঠিগুলিকে একটি ইংরাজ শাসন কর্ত্তার অধীনস্থ করিলেন। তিনি হুগলীতে তাঁহার স্থায়ী আবাস স্থান স্থাপন করিরা একটি সামান্য সৈন্যদল তাঁহার শরীর রক্ষার জন্য নিযুক্ত করিলেন। বাঙ্গলা দেশে ভবিষ্যতে ইংরাজ শাসনের সূচনা এইরূপ সামান্য ভাবে আরম্ভ হইল।

নবাবের সহিত যখন ইংরাজ বণিকদিগের কলহ বাড়িয়া যাইতে লাগিল তখন তাঁহারা তদানীন্তন সময়ের রাজা দ্বিতীয় জেম্‌সের কাছ হইতে মোগলের সঙ্গে লড়াই করিবার অনুমতি চাহিয়া লইলেন। নৌ সেনাপতি নিকলসন সাহেব আরাকান রাজের সহযোগিতায় চট্টগ্রাম অধিকার করিবার মতলব করিয়া বঙ্গোপসাগরে আসিলেন, কিন্তু ঝড়ে তাঁহার জাহাজগুলি ছত্র ভঙ্গ হইয়া পড়িল, কতকগুলি

জাহাজ লইয়া তিনি হুগলীর নিকটে আসিয়া লঙ্গর ফেলিলেন। এদিকে সায়েস্তা খাঁ ইংরাজদিগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া ইংরাজদের সঙ্গে সন্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়া লোক পাঠাইলেন, কিন্তু বাজারে মোগল সৈন্যের সহিত ইংরাজ নাবিকদিগের অকস্মাৎ ঝগড়া বাঁধিল এবং উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। সায়েস্তা খাঁ পাটনা, ঢাকা, কাশিমবাজার এবং মালদার ইংরাজ কুঠী বাজেয়াপ্ত করিবার হুকুম দিলেন। হুগলীর কুঠীয়াল সাহেবগণ দেখিলেন যে হুগলীতে লড়াই করিলে তাঁহাদের সুবিধা হইবে না, সেইজন্য বর্ত্তমান কলিকাতাস্থিত সুতানটি গ্রামে আসিয়া তাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইখানে তাঁহারা জাহাজের আশ্রয়ে থাকিতে পারিবেন বলিয়া এই স্থানটি তাঁহারা মনোনীত করেন।

কিন্তু শীতের সময়ে কাতারে কাতারে নবাব সৈন্য হুগলীতে আসিয়া জড় হইল। এই অবস্থায় সুতানটি নিরাপদ নয় বলিয়া ইংরাজ সেনাপতি চার্ণক সাহেব গঙ্গার মোহানায় অবস্থিত ইঞ্জিলি বলিয়া একটি দ্বীপে জাহাজ এবং সৈন্য সরাইয়া আনিলেন; এখানে আসিয়া তাঁহারা কয়েকটি মোগল জাহাজ ধ্বংশ করিলেন। এই স্থানটি এমন সুরক্ষিত যে মোগল সৈন্য এখান হইতে ইংরাজ-দিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিবে না বলিয়া সেনাপতির দৃঢ় বিশ্বাস হইল।

মোগল সেনাপতির নাম আবদুল সমদ খাঁ, ইনি দেখিলেন

যে ইঙ্গিলির মতন অস্বাস্থ্যকর স্থানে ইংরাজগণ বেশী দিন থাকিতে পারিবে না, সেইজন্য তিনি কোন যুদ্ধের আয়োজন না করিয়া শুধু অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কিছু দিন পরে ইংরাজ সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই জ্বরে মারা গেল, এবং যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহারা শয্যাগত হইল।

এই অবস্থায় নবাব সায়েস্তা খাঁ ইংরাজদিগের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সন্ধিতে স্থির হইল যে মোগলগণ ইংরাজদিগের বাণিজ্যের উপর কোন শুল্ক আদায় করিবেন না, উলুবেড়িয়াতে গঙ্গার ধারে কুঠী নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি তাহাদিগকে দেওয়া হইল।

এদিকে বাদশাহ আওরেঙ্গজেব ইংরাজদিগের ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। একটি জাহাজে মুসলমানগণ মক্কাতীর্থে যাইতেছিল, ইংরাজগণ সেই জাহাজ অবরোধ করে, তাহা ছাড়া মাহরাট্টা রাজা শম্ভুজীর সহিত তাহাদের সন্ধি হয়, এবং তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বোম্বাই এবং অন্যান্য যায়গায় ইংরাজগণ দুর্গ নির্ম্মাণ করে, সম্রাট এই সকল ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হইয়া হুকুম দিলেন, "আমার সাম্রাজ্য হইতে এই ফিরিঙ্গিগুলাকে তাড়াইয়া দাও।"

সম্রাটের হুকুম অনুসারে নবাব সায়েস্তা খাঁ ইংরাজ বণিকদিগের সঙ্গে বাঙ্গলা দেশে শত্রুতা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তার পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। সায়েস্তা খাঁর সময়ে বাঙ্গলায় চালের মণ আট

আনায় নামে, এই ঘটনা স্মরণ করিয়া রাখিবার জন্য নবাব ঢাকার পশ্চিম ফটকটি দেওয়াল তুলিয়া গাঁথিয়া ফেলেন এবং আদেশ করিয়া যান, চালের দর এইরকম না নামিলে যেন এই ফটকটি না খোলা হয়। প্রজার খাওয়ার পরার দুর্ভাবনা যে শাসনকর্ত্তা যতটা কমাইতে পারেন, তিনি তত কৃতী। সায়েস্তা খাঁর নাম এইজন্য আমাদের সকলেরই মনে রাখা উচিত।

সায়েস্তা খাঁর পরে বাঙ্গলা দেশে যে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার চরিত্র ঠিক সায়েস্তা খাঁর বিপরীত। সায়েস্তা খাঁ দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের প্রতিপালন করিতেন, কিন্তু ইব্রাহিম খাঁ কার্য্য-বিমুখ অলস প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি সেইজন্য ইংরাজদিগের সহিত এক প্রকার নিষ্পত্তি করিয়া লইলেন। আওরেঙ্গজেব দেখিলেন যে যদিও তিনি খুব সহজে ইংরাজদিগকে স্থল হইতে তাড়াইয়া দিতে পারেন, কিন্তু জলে তাহাদের সহিত পারা যায় না। মোগলদিগের নৌ-পোত ছিল না, ইংরাজদিগের নৌ-পোত ছিল। সেইজন্য তাহারা সমুদ্রে মোগলদিগের জাহাজ লুণ্ঠন করিয়া হিন্দুস্থানের ব্যবসার বিশেষ ক্ষতি করিতে পারিত। এই সব কারণে তিনিও ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিতে তাঁহার সকল শাসন কর্ত্তার উপরেই হুকুম দিলেন। ইংরাজরা বাঙ্গলা দেশে ফিরিয়া আসিয়া সুতানটীতে কুঠী স্থাপন করিল।

ইব্রাহিমের অযোগ্যতার জন্য বাঙ্গলা এবং উড়িষ্যায় বিদ্রোহ

বাধিয়া উঠিল। তখন ইংরাজ এবং অন্যান্য বিদেশী বণিক নবাবের অনুমতি লইয়া দুর্গ নির্ম্মাণ করিল; ওলন্দাজগণ চুঁচড়ায়, ফরাসীগণ চন্দননগরে এবং ইংরাজগণ সুতানটীতে সুরক্ষিত দুর্গ তৈয়ারী করিল। বাঙ্গলায় ইংরাজ প্রতিপত্তির এইটি দ্বিতীয় সোপান।

আওরেঙ্গজেব ইব্রাহিমের অযোগ্যতায় অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পরিবর্ত্তে তাঁহার পৌত্র আজিমুশ্বানকে বাঙ্গলার সম্রাটের প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইলেন।

আজিমুশ্বানও বিশেষ কর্ম্মিষ্ঠ ছিলেন না। ইংরাজদিগের উন্নতিতে ওলন্দাজগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া আজিমুশ্বানের নিকটে তাঁহারা ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিতে লাগিল। ইংরাজগণ ওলন্দাজের ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়া মিঃ ওয়াল্‌স্‌কে তাঁহাদের প্রতিনিধি করিয়া আজিমুশ্বানের নিকট পাঠাইল। অনেক বিলম্বের পর এবং নানা উপঢৌকন দেওয়ার পর আজিমুশ্বান বাঙ্গলা দেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার বাহাল রাখিলেন এবং তাহাদিগকে আরও অনেক জায়গা জমি কিনিতে অনুমতি দিলেন।

১৭০৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুতানটির নিকটে ফোর্ট উইলিয়াম বলিয়া একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। এই দুর্গ নির্ম্মাণে মোগল নবাব কোন বাধা দিলেন না। তখনকার অরাজকতা এবং দেশে স্থায়ী শান্তির অভাবে যাহারা অত্যন্ত

উদ্বিগ্ন থাকিত তাহাদের মধ্যে অনেকেই কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিতে লাগিল।

আওরেঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর বাদশাহী করিবার লোভে আজিমুশ্বান উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে রওনা হইলেন কিন্তু তিনি তাঁহার খুড়ার সহিত লড়াইয়ে পরাজিত এবং নিহত হন।

মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গলার নবাব হইলেন। তিনি দিল্লীর নানা ভাগ্য বিপর্য্যয়ের মধ্যেও বাঙ্গলায় নিজের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন। সায়েস্তা খাঁর পরেও বাঙ্গলা দেশে তাঁহার মতন সুযোগ্য শাসনকর্ত্তা কখনও হয় নাই। একদিকে যেমন জমিদারদিগের নিকট হইতে ন্যায্য পাওনা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিতেন, অপরদিকে আবার তিনি যাহাতে চাউল এবং আহার্য্য বস্তুর দাম কম থাকে তাহার জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। যদি কেহ বেশী লাভের জন্য চাউল কিনিয়া গুদামজাত করিয়া রাখিত তাহা হইলে খাদ্যাভাব হইলে তিনি তাঁহার যথোচিত শাস্তি বিধান করিতেন। যখন বাঙ্গলায় আজিমুশ্বান শাসনকর্ত্তা ছিলেন তখন তিনি বাঙ্গলার দেওয়ান ছিলেন। পূর্ব্বে তিনি এক ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন, কিন্তু একজন পারসিকের নিকট ক্রীতদাস হইয়া পারস্য দেশে গিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মনিবের মৃত্যুর পর তিনি স্বাধীন হন; এবং অল্প সাহিনায় দক্ষিণ দেশে সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হইয়া অবশেষে অসাধারণ প্রতিভা এবং

কার্য্যানুরাগের জন্য বাদশাহ্ আওরেঙ্গজেবের সুনজরে পড়েন। অবশেষে যখন আজিমুশ্বান বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তাপদে নিযুক্ত হন, তখন আওরেঙ্গজেব কর্ত্তৃক মুর্শিদকুলীখাঁ বাঙ্গলার দেওয়ানপদে নিযুক্ত হন। দেশে শান্তিরক্ষা, বিচার কার্য্য এবং অন্যান্য গুরুতর বিষয়ের ভার থাকিত শাসনকর্ত্তার (নাজিমের) হাতে, রাজস্ব আদায় এবং তাঁহার হিসাব রাখার ভার থাকিত দেওয়ানের হাতে, তিনি তাঁহার বিভাগে স্বাধীন ছিলেন, বাদসাহই শুধু তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিতেন। অবশ্য শাসনকার্য্য চালাইবার জন্য নাজিম তাঁহার কাছ হইতে খরচের টাকা লইতেন। মুর্শিদকুলী খাঁ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব রাখিতেন, খাজনা আদায় সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত কড়াকড়ি করিতেন। আজিমুশ্বান মুর্শিদকুলী খাঁকে দেখিতে পারিতেন না। রাজস্ব অনেক জমিদারের কাছে বাকী পড়িয়া গিয়াছিল। তিনি যখন তাঁহাদের বাকি বকেয়া আদায় করিতে পারেন নাই, তখন তিনি তাহাদিগকে কয়েদে বন্দী করিলেন, চারিদিকে তাঁহার শত্রুর সৃষ্টি হইল। আজিমুশ্বান দেওয়ানের একটি শত্রুপক্ষের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ঠিক করিলেন যখন প্রতিদিনের নিয়মমত দেওয়ান নবাব সভায় আসিবেন, তখন তাহারা সৈন্যদল লইয়া তাঁহার উপরে পড়িয়া তাঁহাকে হত্যা করিবে। মুর্শিদকুলীখাঁ যেমন প্রাতঃকালে নবাব বাড়ী চলিতেছেন, তখন এক দল লোক আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার সশস্ত্র

অনুচরবৃন্দ এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে তাঁহাদের মনিবের জীবন বাঁচাইবার জন্য লড়িতে লাগিলেন যে ষড়যন্ত্রকারীরা ভয় পাইয়া পলাইয়া গেল। মুর্শিদকুলী খাঁ নবাব সভাতে আসিয়া আজিমুশ্বানকে ষড়যন্ত্রের কথা জানাইয়া নবাব-নাজিম যে ইহাতে লিপ্ত আছেন তাহা বলিয়া তাঁহাকে ভৎর্সনা করিলেন। তাহার পর ঢাকায় থাকা বিপজ্জনক এই ভাবিয়া তিনি মুর্শিদাবাদে চলিয়া আসিয়া বাদশাহের কাছে তাঁহার পৌত্রের বিরুদ্ধে একটি চিঠি লিখিলেন। সেই চিঠিতে তিনি কেমন করিয়া বাঙ্গলার রাজস্ব বাড়াইয়াছেন এবং কেন তিনি আজিমুশ্বানের বিরাগ ভাজন হইয়াছেন সমস্ত কথা খুলিয়া লিখিলেন। পূর্ব্ব হইতেই আওরেঙ্গজেব আজিমুশ্বানের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এখন মুর্শিদকুলী খাঁর সঙ্গে তাঁহার এই দুর্ব্যবহারে তিনি তাঁহার নাতির উপর ভয়ানক চটিয়া গেলেন। একদিকে আওরেঙ্গজেবের মতন ন্যায়পরায়ণ সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে কখনও বসেন নাই। তিনি আজিমুশ্বানকে তীব্র ভৎর্সনা করিয়া চিঠি লিখিলেন এবং বাঙ্গলার শাসনভার মুর্শিদকুলীর হাতে দিয়া তাঁহাকে বিহারে গিয়া থাকিবার আদেশ দিলেন। আজিমুশ্বান সম্রাটকে বিশেষভাবে চিনিতেন। তিনি জানিতেন যে সম্রাটের আদেশের একচুল নড়চড় করিলে সম্রাট তাঁহার রক্ষা রাখিবেন না, অতএব তিনি সম্রাটের হুকুম মতন পাটনায় গিয়া বিহারের শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

আজিমুশ্বান হিন্দুদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য মাঝে মাঝে গেরুয়া পোষাক এবং পাগ্ড়ি পরিতেন এবং ইংরাজের সহিত ব্যবসা করিয়া লাভবান্ হইবার জন্য তিনি ইংরাজদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাহারা বিলাত হইতে যত জিনিষপত্র আমদানী করিত বাঙ্গলায় তাহার একচেটীয়া ব্যবসা করিবার অধিকার পাইলেন। তিনি প্রতিবন্দরে তাঁহার কর্ম্মচারী রাখিয়া দিলেন। তাহারা কোম্পানীর আমদানী মাল সকল খুব কম দামে কিনিয়া বাঙ্গালীর কাছে উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিত। এমন করিয়া বাঙ্গলার নবাব ব্যবসার দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। বাদসাহের কানে যখন এই সকল কথা গেল তখন তিনি নিজের হাতে তাঁহার পৌত্রকে একটী চিঠিতে লিখিলেন, "৪৬ বৎসরের যুবকের মাথায় গেরুয়া পাগ্ড়ি ঠিক ভাল মানায় না, তুমি যে এক চেটিয়া ব্যবসা স্থাপন করিয়াছ তাহা প্রজাদের উপর জুলুম এবং তোমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি কোন অন্যায় অবিচার সহ্য করিতে পারিব না, সে আমার পুত্র কিংবা পৌত্র যে কেহ হউক না কেন, এইজন্য আমি তোমার ঘোড়-সওয়ারদের মধ্য হইতে ৫০০ শত ঘোড়-সওয়ারের বরাদ্দ বন্ধ করিয়া দিলাম।"

আওরেঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যিনিই সম্রাট পদে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহাদের সকলের কাছেই নিয়মিতরূপে

রাজ-উপঢৌকন পাঠাইতেন, সেইজন্য কোন বাদসাহই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন না। মুর্শিদকুলী খাঁ মুর্শিদাবাদে বাঙ্গলার রাজধানী স্থাপিত করিয়া তাহাকে তাঁহার নামানুসারে মুর্শিদাবাদ বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

বিনাশুল্কে ইংরাজদিগের ব্যবসা বাণিজ্য করিবার অধিকার তিনি ভাল মনে করিতেন না।

সম্রাট ফরাক সেয়ারের আমলে ইংরাজ কোম্পানী কয়েকজন ইংরাজকে তাঁহাদের অভাব অভিযোগের কথা জানাইবার জন্য দিল্লীতে পাঠাইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ছিল ডাক্তার উইলিয়াম হামিণ্টন।

ফরাকসেয়ার তখন রাজপুত-রাজা অজিতসিংহের কন্যার সহিত বিবাহ সম্বন্ধ লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি তখন একটী রোগে ভুগিতেছিলেন, সেই রোগটী ভাল না হইলে তাঁহার বিবাহ হইতে পারিবে না; সম্রাট এই সকল ব্যাপার লইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। ডাক্তার হ্যামিণ্টন তাহার রোগ সারাইবার ভার লইয়া অল্পদিনের চিকিৎসার পর সম্রাটকে নিরোগী করিয়া তুলিলেন। মহাধূমধামের সহিত ফরাকসেয়ারের সহিত রাণা অজিতসিংহের কন্যার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর হ্যামিল্টন সাহেব কি পুরস্কার চাহেন যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, তখন তিনি বলিলেন, "সম্রাট, আমি নিজে কোন পুরস্কার চাহি না, আপনি আমাদের কোম্পানীর যদি

সম্রাটের দ্বারা নিযুক্ত হন। তখন দিল্লীর মসনদে মহম্মদ সা অধিষ্ঠিত। সুজা মুর্শিদকুলী খার অভিপ্রায় পূর্ব্ব হইতে অবগত হইয়া গোপনে দিল্লী হইতে নিজের নিয়োগপত্র আনাইলেন এবং যখন জানিতে পারিলেন যে বাঙ্গলার নবাবের বেশীদিন আয়ু নাই, তখন তিনি উড়িষ্যা ছাড়িয়া বাঙ্গলায় চলিয়া আসিলেন। মুর্শিদাবাদে আসিয়া তিনি মুর্শিদকুলী খার মৃত্যুর সংবাদ পাইলেন। কালবিলম্ব করা উচিত নয় জানিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ নিজেকে বাঙ্গলার নবাব বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বড় বড় কর্ম্মচারীদিগকে সম্রাটের নিয়োগপত্র দেখাইলেন এবং সরফরাজ খাঁ কিছু জানিবার পূর্ব্বেই তিনি এই ঘটনা ঢাক পিটাইয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিলেন। সরফরাজখাঁকে মুর্শিদকুলীখাঁ বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তিনি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবেন ঠিক করিলেন, কিন্তু উভয়ের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় স্বজন সরফরাজকে বুঝাইয়া দিলেন যে পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে সকলেই তাঁহাকে ধিক্কার দিবে, সুজাউদ্দিনের বয়স হইয়াছে, তিনি আর কতদিনই বা বাঁচিবেন! তাহার পরে সরফরাজখাঁ নবাব হইতে পারিবেন।

সরফরাজ এই সকল কথা যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া পিতার সহিত মিটমাট করিয়া ফেলিলেন। সুজাউদ্দিনের বেগম জিনেৎ উল কিস্‌সা অত্যন্ত গর্ব্বিতা ছিলেন, তাঁহাকে খুসী করিবার জন্য সুজাউদ্দিন

সরফরাজখাঁ বাঙ্গলার দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু দেওয়ানের কার্য্যে বিশেষ কার্য্যদক্ষতার প্রয়োজন, এই পদের দায়িত্ব শাসন-কর্ত্তার দায়িত্ব অপেক্ষা কম নয়, আজকালকার ভাষায় বলিলে একাধারে তিনি Revenue member এবং অপরদিকে তিনি Accountant General. একজন অল্পবয়স্ক অনভিজ্ঞ যুবক কখন এতবড় দায়িত্বপূর্ণ কাজের উপযুক্ত হইতে পারেন না ভাবিয়া সুজাউদ্দিন রায় আলাম চাঁদকে রায় রায়ান উপাধি দিয়া তাঁহার সহকারী পদে নিযুক্ত করিলেন। সুজাউদ্দিন হাজি আহ্‌মেদ আলিবর্দ্দি খাঁ রায় আলমচাঁদ এবং জগৎশেঠকে লইয়া একটা মন্ত্রণা সভা গঠন করিলেন, এবং তাহাদের সাহায্যে শাসন কার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

মুর্শিদকুলী খাঁ যে সমস্ত জমিদারদিগকে কয়েদে আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন সুজাউদ্দিন তাহাদিগকে মুক্তি দিলেন।

সুজাউদ্দিন নবাব হইয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে বড় বড় চাকুরী দিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে তিনি সরফরাজ খাঁকে দেওয়ানপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার অপর পুত্র মহম্মদ তকিখাঁ উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা পদে, তাঁহার জামাইকে ঢাকার শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত করিলেন। হাজি আহমেদের তিনটি ছেলেই বড় বড় চাকুরী পাইল! এই তিনটি ছেলের নাম নোয়াজিস মহম্মদ, সৈয়দ আহম্মদ এবং জিমুদ্দিন। ইহাদের তিনজনের সহিত আলিবর্দ্দির তিনটি কন্যার বিবাহ হয়।

সুজাউদ্দিন অত্যন্ত জাকজমকপ্রিয় ছিলেন, তিনি মুর্শিদকুলীখাঁর রাজপ্রাসাদ বাসোপযোগী নয় বলিয়া একটি সুন্দর রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি সৈন্যসংখ্যা বাড়াইয়া ২৫ হাজার করিলেন, পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা সমান হইল।

বিহারের শাসনকর্ত্তা অন্যায়াচরণের জন্য কর্ম্মচ্যুত হইল। সুজার ইচ্ছা ছিল সরফরাজকে এই পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাঁহার বেগম সরফরাজখাঁকে সদা সর্ব্বদা কাছাকাছি রাখিতে চাহিতেন, সেইজন্য আলিবর্দ্দি খাঁ বিহারের শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত হইলেন।

আলিবর্দ্দি খাঁ পাটনায় আসিয়া দেখিলেন যে সর্ব্বত্র বিদ্রোহ; জমিদারগণ খাজনা দেয় না। আলিবর্দ্দি খাঁ অত্যন্ত অল্পসময়ের মধ্যেই দেশে শান্তি এবং সুশৃঙ্খলা স্থাপন করেন, সম্রাট সুখী হইয়া তাঁহাকে মহলজঙ্গ উপাধি দিলেন।

সরফরাজ খাঁ ঢাকার দেওয়ান হইয়া ঢাকায় আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে সহকারী হইয়া আসিলেন যশোবন্ত রায়। তিনি মুর্শিদকুলীর অধীনে শাসনকার্য্য শিখিয়াছিলেন, সেইজন্য সরফরাজখাঁর আমলে ঢাকায় চালের দাম আট আনায় মণ হইল, তিনি সায়েস্তা খাঁর বন্ধ ফটক খুলিলেন, ঢাকা জেলায় আগে কম লোকের বাস ছিল, তাঁহাদের সুশাসনে ঢাকায় লোকের বসতি বাড়িল, জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বসবাস হইতে লাগিল, ঢাকার ইতিহাসে সরফরাজ খাঁর শাসন স্বর্ণযুগ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর সরফরাজ খাঁ বাঙ্গলার নবাবপদে আসীন হইলেন। তাঁহার সহিত জগৎশেঠের একটি ঘটনা লইয়া শত্রুতা হইল; সরফরাজ খাঁর সুন্দরী স্ত্রীলোকর উপরে খুব লোভ ছিল, তাঁহার কাণে গেল যে জগৎশেঠের পুত্রবধূর মতন সুন্দরী সচরাচর দেখা যায় না। তিনি জগৎশেঠকে বাধ্য করিয়া তাঁহার পুত্রবধূকে রাজপ্রাসাদে আনাইলেন, এবং তাঁহার প্রতিজ্ঞা মতন শুধু তাঁহাকে দেখিয়া শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। কোন হিন্দু এইরূপ অপমান ক্ষমা করে না, জগৎশেঠ মনে মনে সরফরাজের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। সরফরাজের খামখেয়ালিতে হাজিমহম্মদও তাঁহার উপরে চটিয়া গেলেন, এদিকে আলিবর্দ্দি খাঁর চরগণ দিল্লীতে গিয়া সরফরাজের অত্যাচার এবং নৃশংসতা সম্বন্ধে নানা কথা সম্রাটের কাণে পৌছাইলেন। হাজী আহ্‌মেদ এবং জগৎশেঠ নবাবের কাছে সমস্ত কথা গোপন করিয়া অত্যধিক প্রভুভক্তির ভাণ করিতে লাগিলেন।

যখন মাকড়সার জালে সরফরাজখাঁর চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া ফেলা হইল, তখন আলীবর্দ্দিখাঁ তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা জিনুদ্দিনকে বিহারের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া মুর্শিদাবাদের দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হাজী আহ্‌মেদ আলীবর্দ্দিখাঁকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করাইবার প্রতিশ্রুতি লইয়া আলিবর্দ্দির শিবিরে চলিয়া আসিলেন! আলিবর্দ্দিখাঁ মুর্শিদাবাদের বারো মাইল দূরে আসিয়া শিবির সংস্থাপনা করিয়া নবাবকে লিখিয়া পাঠাইলেন, যে তিনি শুধু

তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য এতদূরে আসিয়াছেন, যুদ্ধ করিবার তাঁহার কোন অভিপ্রায় নাই। নবাব নিশ্চিন্ত হইলেন, তিনি যুদ্ধের কোন আয়োজন করিলেন না। পরদিন আলিবর্দ্দিখাঁ নবাবের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন, হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া তাহারা যে দিকে পারিল সেদিকে পলাইয়া গেল, কিন্তু সরফরাজখাঁ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নড়িলেন না, তিনি তাঁহার হাতীকে শত্রুর মাঝখানে ধাবিত করিয়া দিলেন, একটি গুলির আঘাতে সরফরাজখাঁ নিহত হইলেন।

আলিবর্দ্দিখাঁ ১৭৪০ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলার মসনদে আরোহণ করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র হইতেই তিনি মুর্শিদাবাদে যান নাই, কারণ তিনি জানিতেন যে তাঁহার সৈন্যগণ মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠন করিবে, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরফরাজখাঁর মাতা জিনেৎ বেগমকে একটি চিঠি লিখিলেন।

"কালের অমোঘ দণ্ড-ফলকে যাহা লেখা ছিল তাহা আপনার অযোগ্য এবং অকৃতজ্ঞ দাসের হাতে ঘটিয়াছে, কিন্তু এই দাস প্রতিজ্ঞা করিতেছে, যে যতদিন সে জীবিত থাকিবে ততদিন সে আপনার কোন অমঙ্গল করিবে না, চিরদিনই আপনাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবে। আশা করি তাহার এই নৃশংস এবং নির্ম্মম আচরণ সময়ের গুণে আপনার মন হইতে মুছিয়া যাইবে।" যখন এই চিঠির কোন উত্তর আসিল না তখন তৃতীয় দিনে আলীবর্দ্দিখাঁ সসৈন্যে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিলেন, এবং নবাবের মসনদ অধিকার করিলেন। তাঁহার হাতে মুর্শিদকুলীখাঁ এবং তাঁহার বংশধরদিগের সঞ্চিত বহু অর্থ আসিল,

তিনি তাহা হইতে এক কোটি টাকা দিল্লীর বাদসাহ মহম্মদের কাছে পাঠাইলেন, মহম্মদ তাঁহাকে বিহার উড়িষ্যা এবং বাঙ্গলার শাসন-কর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিলেন।

নবাব হইয়া তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা জিমুদ্দিন শৌকতজঙ্গের পুত্র মির্জা মহম্মদকে সিরাজোদ্দৌল্লা উপাধি দিয়া তাঁহার উত্তরাধি-কারী পদে নির্ব্বাচিত করিলেন। সরফরাজখাঁর পত্নী এবং তাঁহার দুইটি পুত্রকে তিনি ঢাকায় পাঠাইয়া দিয়া তাহাদের ভালরকম মাস-হারার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

উড়িষ্যার সুজাউদ্দিনের জামাতা মুর্শিদকুলীখাঁ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি আলিবর্দ্দিখাঁর শত্রু ছিলেন। আলীবর্দ্দিখাঁ সসৈন্যে তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। কটকের নিকট যে যুদ্ধ হয় তাহাতে মুর্শিদকুলী পরাজিত হইয়া মগুলীপত্তনে পলায়ণ করিলেন। আলিবর্দ্দি তাঁহার ভাইপো সৈয়দ আহম্মদকে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তাপদে নিযুক্ত করিয়া মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু সৈয়দ আহ্‌মেদ অত্যন্ত অনুপযুক্ত এবং অত্যাচারী ছিলেন, তাঁহার অত্যাচারে উড়িষ্যায় আবার বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। বিদ্রোহীদের নেতা বুকিরখাঁ অকস্মাৎ সৈয়দ আহ্‌মেদকে বন্দী করিয়া নিজেকে উড়িষ্যার শাসন-কর্ত্তা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পুনরায় আলীবর্দ্দিখাঁকে উড়িষ্যার পথে রওনা হইতে হইল, তিনি বুকিরখাঁকে আক্রমণ করিবামাত্র তাঁহার সৈন্যবৃন্দ বিদ্রোহীকে ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। অত্যন্ত সহজেই

আলিবর্দ্দিখাঁর জয় হইল, সৈয়দ আহ্‌মেদ তাঁহার হাতে পড়িল, তিনি তাঁহাকে তাঁহার পিতা হাজি আহ্‌মেদের কাছে পাঠাইয়া দিয়া মহম্মদ মাসুমখাঁ বলিয়া একজন কর্ম্মচারীকে উড়িষ্যায় তাঁহার প্রতিনিধিপদে নিযুক্ত করিয়া আবার বাঙ্গলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

খোকা ঘুমা'ল পাড়া জুড়া'ল
বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দিব কিসে ?

ভারতে হুণদিগের অত্যাচারের কথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, বাঙ্গলা দেশে বর্গীর অত্যাচার হুণদিগের অত্যাচার অপেক্ষা কোনঅংশে কম হয় নাই। মাহরাট্টা জাতি মাহরাট্টাকেশরী শিবাজী দ্বারা সংগঠিত হয়, এবং মোগল শক্তিকে বারংবার উপেক্ষা করিয়া ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠে। শিবাজী একটি প্রথার প্রবর্ত্তন করেন যাহার জন্য পরবর্ত্তীকালে মাহরাট্টা রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহ ভয়ানকভাবে উৎপীড়িত হয়। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তা-দিগকে বলিতেন যে তোমরা তোমাদের রাজস্বের একচতুর্থাংশ দাও, তাহা না হইলে তোমাদের রাজ্য আমরা লুণ্ঠন করিব। ভারতবর্ষে তখন এমন প্রবল কোন রাজা ছিল না যে মাহরাট্টাদিগের সমবেত-শক্তিকে বাধা দিতে পারে। অতএব শাসনকার্য্যে নানারূপ

অসুবিধা করিয়া মাহরাট্টা জাতির দুর্ভাগ্য প্রতিবাসীদিগকে মহারাট্টাদের চৌথ যোগাইতে হইত।

মধ্যপ্রদেশের অনেকটা অংশ তখন রঘুজী ভোঁসলা বলিয়া একজন শাসনকর্ত্তার অধীনে আসিয়াছিল। তাঁহার রাজধানী বর্ত্তমান নাগপুর। তাঁহার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত অগণ্য সৈন্যসামন্ত লইয়া বাঙ্গলা দেশের দিকে রওনা হইলেন। আলীবর্দ্দি খাঁ যখন উড়িষ্যা দেশ হইতে ফিরিতেছিলেন, তখন খবর পাইলেন যে ভাস্কর পণ্ডিত তাহার ৪০ মাইল দূরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছেন। নবাবের সৈন্যসংখ্যা খুব বেশী ছিল না। তিনি তাড়াতাড়ি বর্দ্ধমানে পঁহুছিবার জন্য রওনা হইলেন। বর্দ্ধমানে আসিয়াই শুনিলেন যে বর্গীরা (মাহরাট্টাদিগকে বাঙ্গলা দেশে বর্গী বলিত) বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী বায়গা লুণ্ঠন করিয়া বহুসংখ্যক গ্রাম আগুন দিয়া জ্বালিয়া দিয়াছে, তাহাদের হাতে যাহারা পড়িয়াছিল তাহাদের কাহারও জীবনরক্ষা হয় নাই। এই নৃশংস দস্যুরা যে পথ দিয়া গিয়াছে তাহা মরুভূমিতে পরিণত করিয়াছে।

আলীবর্দ্দি খাঁ বর্দ্ধমানে সৈন্যদের মধ্যে অনেককে রাখিয়া মুর্শিদাবাদের পথে রওনা হইতে চাহিলেন কিন্তু বর্গীদের আতঙ্ক লোকের মনে এত ঢুকিয়াছিল যে কেহই বর্দ্ধমানে থাকিতে চাহিল না, তাহারা আলীবর্দ্দির সঙ্গে মুর্শিদাবাদের পথে যাত্রা করিল। পথে মাহারাট্টাদের সহিত যুদ্ধে নবাবের অধিকাংশ সৈন্য নিহত হইল,

এবং তাহারা নবাবের কামান এবং টাকা পয়সা যাহা ছিল তাহা কাড়িয়া লইল, কিন্তু নবাব ভাস্কর পণ্ডিতের কাছে লোক পাঠাইয়া খবর দিলেন যে তিনি দশলক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। যদি তাহারা বাঙ্গলাদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, কিন্তু তাহাদের লোভ বাড়িয়াছে। ভাস্কর এক কোটি টাকার দাবী এবং নবাবেব সমস্ত হাতীর দাবী করিলেন, নবাব যদিও অশেষ দুর্দ্দশায় পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার আত্মসম্মানে একেবারে বিসর্জ্জন দিলেন না। তিনি মাহরাট্টাদিগের দাবী পূর্ণ করিতে অসম্মত হইলেন, তিন দিবস যাবৎ মাহারাট্টার সহিত নবাবের সৈন্যের লড়াই হয়—খাদ্যাভাবে এবং জলাভাবে নবাবের সৈন্যগণ অশেষ কষ্ট পাইল, কিন্তু প্রবল মাহারাট্টা সৈন্যের সম্মুখে সুশৃঙ্খলা রাখিয়া নবাব সৈন্য কাটোয়ায় পহুঁছিলেন। একজন বিদেশী ঐতিহাসিক এই ঘটনার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে এই সময়ে বাঙ্গালী সৈন্য যে সাহস এবং ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছিল, ইতিহাসে তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। কাটোয়ায় ভাগিরথী নদী নবাব সৈন্যকে রক্ষা করিল। আলীবর্দ্দি এখানে পহুঁছিয়া তাঁহার জামাতা নোয়াজিস মহম্মদকে সৈন্য এবং প্রচুর খাদ্য সম্ভার লইয়া শীঘ্র কাটোয়ায় আসিতে লিখিয়া পাঠাইলেন।

এদিকে বর্ষা আসন্ন প্রায়, ভাস্কর পণ্ডিত তাঁহার অধীনস্থ একটা মুসলমান সেনানীর পরামর্শে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইয়া

রাজধানীর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকল লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। জগৎ শেঠ তখনকার দিনে ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি ছিলেন, ভাস্কর পণ্ডিত তাঁহার অর্থাগার লুণ্ঠন করিয়া তিনলক্ষ টাকা পাইলেন। বর্ষার মধ্যেই ভাস্কর পণ্ডিত প্রায় সমস্ত পশ্চিম বঙ্গ দখল করিয়া ফেলিলেন; নবাবের হাতে রহিল শুধু মুর্শিদাবাদ এবং পূর্ব্ববঙ্গ।

বর্গীর নৃশংস অত্যাচারের বর্ণনা সমসাময়িক একজন অজ্ঞাতনামা লেখক "মহারাষ্ট্র পুরাণ" নামক একটি কাব্যে লিখিয়া গিয়াছেন। এ কবিতাটি চাষীর ভাষায় লেখা। এই মর্ম্মান্তিক বর্ণনা যথাযথ যে নিজের ভাষায় তোমাদিগকে না বলিয়া "মহারাষ্ট্র পুরাণ" হইতে এই স্থানটুকু তোমাদিগকে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

আলীবর্দ্দি খাঁ নিরাপদে কাটোয়ায় পৌছিলে :—

"তবে সব" বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল।
জত গ্রামের লোক সব পলাইল॥
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পলাএ পুঁথির ভার লইয়া।
সোনার বাইনা পলায় কত নিক্তি হড়পি লইয়া॥
গন্ধ-বণিক পলাএ দোকান লইয়া যত।
তামা পিতল লইয়া কাঁসারি পলাএ কত॥
কামার কুমার পলাএ লইয়া চাক নড়ি
জাউলা মাউছা পলাএ লইয়া জাল দড়ি॥

সঙ্কবণিক পলাএ করা লইয়া যত।
চতুর্দ্দিকে লোক পলাএ কি বলিব কত॥

*　　*　　*　　*　　*

সেক সৈয়দ মোগল পাঠান যত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম শুইনা সব পলাইল।
গর্ভবতী নারী যত না পারে চলিতে
দারুণ বেদনা পেয়ে প্রসবিছে পথে॥

*　　*　　*　　*　　*

ছোট বড় গ্রামে জত লোক ছিল
বরগির ভএ সব পলাইল।

*　　*　　*　　*　　*

এই মতে সব লোক পলাইয়া জাইতে
আচম্বিতে বরগি ঘেরিল আইসা পথে।
মাঠে ঘেরিয়া বরগি দেয় তবে সাড়া
সোনা রূপা নেএ আর সব ছাড়া।
কারু হাত কাটে, কারু নাক কাণ
একি চোটে কারু বধএ পরাণ।
ভাল ভাল স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ
আঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তের গলাএ।
একজনে ছাড়ে তারে আর একজনা ধরে।

* * * * *

তবে মাঠে লুটিয়া বরগি গ্রামে সাধাএ
বড় বড় ঘরে আইসা আগুনি লাগাএ।
বাঙ্গালা চৌ আরি জত বিষ্ণু মোণ্ডব
ছোট বড় ঘর আদি পোড়াইল সব।
এই মতে জত সব গ্রাম পোড়াইয়া
চতুর্দ্দিকে বরগি বেড়াএ লুটিয়া।
কাহাকে বাঁধি বরগি দিএা পিঠ মোড়া
চিত কইরা মারে লাথি পাএ জুতা চড়া।
রুপি দেহ দেহ বোলে বারে বারে
রুপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে।
কাহাকে ধরিয়া বরগি পথইরে ডুবাএ
ফাফর হইএগা তবে কারু প্রাণ জাএ।
এই মত বরগি কত বিপরীত করে
টাকা কড়ি না পাইলে তারে প্রাণে মারে।
জার টাকা কড়ি আছে সেই দেয় বরগিরে
জার টাকা কড়ি নাই সেই প্রাণে মরে॥
ত্রেতা জুগে রাজা ভগীরথ ছিলা
অনেক তপস্যা করি গঙ্গা আনিলা॥

পৃথিবীতে নাম তবে হইলা ভাগিরথী
তার পরে হইয়া লোকে পাইলা অব্যাহতি ॥

ইহা ছাড়া স্ত্রীলোকের ধর্ম্মনাশ করা, টাকা না পাইলে তাহাদের স্তন কাটিয়া দেওয়া এই ছিল মনুষ্য নামের অযোগ্য এই বরগিদের ব্যবসা। ইহাদের ভয় দেখাইয়া বাঙ্গালী মায়েরা তাঁহাদের শিশু সন্তানকে ঘুম পাড়াইতেন :—

খোকা ঘুমাল পাড়া জুড়াল
বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দিব কিসে।

এই দারুণ বিপদের সময় দলে দলে লোক আসিয়া কলিকাতার গঙ্গা পার হইয়া ইংরাজদিগের আশ্রয় লইল। ইংরাজগণ আলী-বর্দ্দির অনুমতি লইয়া গঙ্গার বিপরীত দিকে একটি পরিখা কাটিয়া কলিকাতাকে সুরক্ষিত করিল। এই পরিখার নাম "মাহারাট্টা ডিচ্।" মাহারাট্টাগণ পশ্চিমবঙ্গ এবং উড়িষ্যা দেশ ছারখার করিয়া বর্ষাকালে বীরভূমিতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল।

বর্ষা শেষ হইবার পর আলীবর্দ্দি খাঁ গঙ্গা পার হইয়া মাহারাট্টা-দিগকে আক্রমণ করিলেন। মাহারাট্টাদের মধ্যে ঘরোয়া বিবাদ বাঁধাতে তাহারা নাগপুরে চলিয়া গেল।

কিন্তু পরের বৎসর ভাস্কর পণ্ডিত বিশাল সৈন্যদল লইয়া বাঙ্গালা

আক্রমণ করিলেন। তিনি বাঙ্গালায় আসিয়াই আলিবর্দ্দির কাছে চৌথের দাবী করিলেন, আলীবর্দ্দি চৌথ দিব বলিয়া স্বীকার করাতে ভাস্কর পণ্ডিত নবাবের শিবিরে আসিলেন। নবাব তাঁহার সৈন্যদল শিবিরের চতুর্দ্দিকে লুকায়িত রাখিয়াছিলেন, তাঁহার ইঙ্গিত পাইবা মাত্র সৈন্যগণ ভাস্কর পণ্ডিতের উপর পড়িয়া তাঁহার অনুচর বৃন্দসহ তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিল। দলপতির মৃত্যুতে মাহারাট্টা সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

আলীবর্দ্দি খাঁ তাঁহার সেনাপতি মুস্তাফা খাঁর নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী ছিলেন। মুস্তাফা এখন হইতে নবাবের সমান বলিয়া নিজেকে মনে করিতে লাগিলেন এবং "ইহাকে চাকুরী দাও, উহাকে অর্থ দাও" বলিয়া নবাবকে সকল সময়েই উত্যক্ত করিতে লাগিলেন। নবাব মুস্তাফার প্রতিপত্তিতে আশঙ্কান্বিত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে যখন একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল তখন আলীবর্দ্দি খাঁ তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দিয়া চাকুরী হইতে তাঁহাকে অবসর দিলেন। বিহারের শাসনকর্ত্তা হইবার ইচ্ছা মুস্তাফা খাঁর ছিল। সেইজন্য চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াই তিনি সৈন্য সামন্ত লইয়া বিহারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। তখন সিরাজদ্দৌলার পিতা জইমুদ্দিন ছিলেন বিহারে নবাবের প্রতিনিধি। আলীবর্দ্দি খাঁ মুস্তাফার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া সসৈন্যে মুস্তাফা খাঁর পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

মুস্তাফা খাঁর অধীনে আট হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। জইনুদ্দিনের অধীনে মাত্র পাঁচ হাজার অনভিজ্ঞ সৈন্য ছিল, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মুস্তাফা খাঁর আগমনে পলাইয়া গেল। জইনুদ্দিনের অধীনে রহিল মাত্র কয়েকশত বিশ্বাসী সৈন্য। জইনুদ্দিন অত্যন্ত সাহসী পুরুষ ছিলেন। তিনি এই সামান্য সংখ্যক সৈন্য লইয়াই মুস্তাফা খাঁর সহিত যুদ্ধ করিলেন।

মুস্তাফা যুদ্ধে আহত হওয়াতে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে তিনি খবর পাইলেন যে আলীবর্দ্দি খাঁ বিহারে আসিয়া পহুঁছিয়াছেন, এই শুনিয়াই তিনি অযোধ্যার নবাব সফদর জঙ্গের আশ্রয় লইলেন।

এদিকে মাহারাট্টাগণ পুনরায় রঘুজী ভোঁসলার অধীনে বাঙ্গালা আক্রমণ করিলেন। নবাব তাড়াতাড়ি মুর্শিদাবাদে আসিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। যে পর্য্যন্ত তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত না হইলেন, ততদিন পর্য্যন্ত রঘুজী ভোঁসলাকে টাকার লোভ দেখাইয়া নিষ্কর্ম্মা করিয়া রাখিলেন। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সৈন্য সামন্ত লইয়া মুর্শিদাবাদ হইতে রওনা হইলেন, রঘুজী আলীবর্দ্দির সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিতে সাহস পাইলেন না, তিনি শোন নদী পার হইয়া মুস্তাফা খাঁর অবশিষ্ট সৈন্যদলের সহিত যুক্ত হইয়া নবাবের সৈন্যদলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নবাব মুর্শিদাবাদ রক্ষার জন্য আবার পিছাইয়া আসিলেন এবং কাটোয়ার নিকট সম্মুখ যুদ্ধে

রঘুজী ভোঁসলাকে পরাজিত করিলেন; রঘুজী ভোঁসলা নাগপুরে পলাইয়া আসিলেন।

উড়িষ্যা হইতে বর্গীদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য অক্লান্ত কর্ম্মী বৃদ্ধ নবাব মিরজাফর খাঁকে কটকে পাঠাইলেন। কটকের পথে মেদিনীপুরে বর্গীদিগকে একটি সামান্য যুদ্ধে হারাইয়া অলসপ্রকৃতির সেনাপতি মিরজাফর মেদিনীপুরেই রহিয়া গেলেন, এদিকে বেরার হইতে রঘুজী ভোঁসলা তাঁহার পুত্র জানোজীকে প্রচুর সৈন্য সামন্ত দিয়া কটকে পাঠাইলেন, মাহারাট্টাগণ পুনরায় বাঙ্গালা আক্রমণ করিল। মিরজাফরের অকর্ম্মণ্যতায় ক্রুদ্ধ হইয়া নবাব আতাউল্লা নামক তাঁহার আর একজন কর্ম্মচারীকে মাহারাট্টাদিগের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। আতাউল্লা বর্দ্ধমানের নিকট একটি যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া মীরজাফর খাঁর সহিত নবাবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। এই দুইটি সেনাপতিকে হারাইয়াও নবাব বাঙ্গালাকে বর্গীদের হাত হইতে রক্ষা করিবার কাজে কিছুমাত্র শিথিলতা দেখাইলেন না, বর্গীগণকে তিনি উপর্য্যুপরি যুদ্ধে পরাজিত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু আলীবর্দ্দি খাঁর বিপদের উপরে বিপদ। নবাবের অধীনে দুইটি আফগান সেনাপতি ছিল, তাঁহাদের নাম শম্‌সের খাঁ এবং সবদার খাঁ, তিনি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ইহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করেন। তাঁহারা দ্বারভাঙ্গায় আসিয়া স্বাধীন ভাবে তাঁহাদের

জমিদারী উপভোগ করিতে লাগিলেন,—নবাবের জামাতা জইনুদ্দিন ইহাদের ব্যবহারে প্রমাদ গণিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া পুনরায় বড় চাকুরী দিতে চাহিলেন। জইনুদ্দীন তাঁহাদের শিবিরে গিয়া তাঁহাদের সহিত দেখা করিলেন এবং নিজে কোন সতর্কতা অবলম্বন না করিয়াই—এই দুইজন সেনাপতিকে তাঁহার সহিত দেখা করিবার অনুমতি দিলেন। এই হঠকারিতার ফল তাঁহাকে ভোগ করিতে হইল, আফগান সৈন্যগণ দলে দলে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিল এবং একটি গোলমাল তুলিয়া জইনুদ্দিনকে তাঁহার মসনদেই হত্যা করিল, নবাব কন্যা আমিনা বেগম এবং তাঁহার পরিবারস্থ অন্যান্য সকল লোক শমসেরের হাতে পড়িল। শমসের নিজেকে বিহারের শাসনকর্ত্তা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আলীবর্দ্দি খাঁর চতুর্দ্দিকে শত্রু; মাহারাট্টাগণ তখন বাঙ্গালা দেশ ছাড়িয়া যায় নাই, উত্তরদিকে আবার প্রবল বিদ্রোহ। তাঁহার নয়নপুত্তলী কন্যা আমিনা বেগম শত্রুদের হাতে বন্দিনী, তাঁহার সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক। তিনি তাঁহার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীবৃন্দকে ডাকাইয়া আনাইয়া এই বিপদের সময় তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। নবাবের বিপদে সকলেরই মন গলিয়া গিয়াছিল, তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাঁহারা নবাবকে কিছুতেই ত্যাগ করিবেন না। সৈন্যগণও কোরাণ ছুঁইয়া শপথ করিল যে তাহারাও নবাবের নিমকহারামি করিবে না। আলীবর্দ্দি

খাঁ আশ্বস্ত হইয়া সৈন্য সামন্ত লইয়া বিহারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

তিনি নিরাপদে মুঙ্গেরে আসিয়া পঁহুছিলেন। মাহারাট্টাগণ ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দিয়াছে কিন্তু আফগান দলপতিদের মধ্যে বিবাদ বাঁধিয়া উঠিল। একজন দলপতি সৈন্যদের মধ্যে রটাইয়া দিল "নবাব সৈন্য আসিয়াছে" চতুর্দ্দিকে গোলমাল হইতে লাগিল। পরদিন সকালে আলীবর্দ্দি খাঁ পাঠান সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন; দলে দলে পাঠানগণ শমসের খাঁকে ছাড়িয়া যাইতে লাগিল। শমসের খাঁ যুদ্ধে নিহত হইল, একজন তুর্কী সৈন্য তাঁহার মাথা কাটিয়া আনিয়া আলীবর্দ্দি খাঁকে উপহার দিল।

জইনুদ্দিনের বেগম নবাবের প্রিয়তমা কন্যা আমিনা বেগম এবং তাঁহার অপরাপর আত্মীয় স্বজনকে নবাব উদ্ধার করিয়া তাঁহার আদরের দৌহিত্র সিরাজকে বিহারের শাসনকর্ত্তা পদে নবাব নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু সিরাজ বালক মাত্র, সেইজন্য তাঁহার সহকারীরূপে তিনি রাজা জানকীরামকে পাটনায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া সসৈন্যে মুর্শিদাবাদে ফিরিলেন।

১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে বর্ষা শেষ হইবার পর আলিবর্দ্দি খাঁ বর্গীদিগকে তাড়াইবার জন্য উড়িষ্যা দেশে যাত্রা করিলেন। মাহারাট্টা নবাবের আগমনেই কটক ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু নবাব

উড়িষ্যা ছাড়িলেই পুনরায় তাহারা সেই দেশ দখল করিলেন। নবাব এবার ঠিক করিলেন যে তিনি মেদিনীপুরে সসৈন্যে অবস্থান করিবেন। তাহা হইলে মাহারাট্টাগণ ভয় পাইয়া উড়িষ্যা দেশ অধিকার করিবার সংকল্প ত্যাগ করিবেন।

কিন্তু মুর্শিদাবাদ হইতে খবর আসিল যে তাঁহার আদরের নাতী সিরাজ বিহারের মসনদ স্বাধীনভাবে দখল করিবার জন্য পাটনার দিকে রওনা হইয়াছেন। আলীবর্দ্দি খাঁ জানিতেন যে বিশ্বাসী রাজা জানকীরাম নবাবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই কার্য্যে সিরাজকে বাধা দিবেন। বৃদ্ধ আলীবর্দ্দি সিরাজের জীবনের আশঙ্কায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, তিনি সিরাজকে একটি স্নেহসূচক চিঠি লিখিয়া তাহাকে এই কার্য্য হইতে বিরত হইতে আদেশ করিলেন,—কিন্তু সিরাজ তাহা গ্রাহ্য না করিয়া উত্তরে লিখিলেন "আপনার স্তোক-বাক্যে আমি ভুলিব না, আমি আমার নিজের ন্যায্য দাবী বলপূর্ব্বক অধিকার করিব। আর যদি নিতান্তই বিবাদ উপস্থিত করেন তাহা হইলে হয় আপনার মস্তক আমার ক্রোড়দেশে না হয় আমার মস্তক আপনার পাদদেশে লুটাইবে।"

সিরাজের আগমনে রাজা জানকীরাম অত্যন্ত মুস্কিলে পড়িলেন। তিনি নবাবের অনুমতি ছাড়া সিরাজকে পাটনায় প্রবেশ করিতে দিতে পারেন না, অথচ যুদ্ধ হইলে সিরাজের কোন বিপদ হইতে পারে এই সকল ভাবিয়া তিনি পাটনার প্রাচীরদ্বার বন্ধ করিয়া

দিলেন। সামান্য যুদ্ধ হইল, সিরাজের দল পরাজিত হইয়া সিরাজ নগরের বাহিরে সামান্য একটি কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এদিকে আলীবর্দ্দি খাঁ পাটনায় আসিয়া পঁহুছিয়াই প্রথমে সিরাজের সঙ্গে দেখা করিলেন। চক্ষের জলে উভয়ের মিলন হইল।

নাতীকে লইয়া বৃদ্ধ নবাব মুর্শিদাবাদে ফিরিলেন; মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া তিনি মাহারাট্টাদিগের সহিত সন্ধি করিলেন, সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে উড়িষ্যা দেশ মাহারাট্টাদিগকে স্থায়ী ভাবে দিয়াছিলেন। নবাব বাঙ্গালার চৌথ স্বরূপ তাহাদিগকে বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার পাইলেন। বাঙ্গালা দেশে শান্তি স্থাপিত হইল।

ইহার অল্পদিন পরে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যু হইল।

সরফরাজ খাঁর সহিত বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আলীবর্দ্দি খাঁ তাঁর নাতী সিরাজের জন্য আর একটি কলঙ্ক ভাগী হন।

ঢাকায় তাঁহার বড় মেয়ে ঘেসিটি বেগম তাঁহার স্বামী নোয়াজিস মহম্মদের কাছে থাকিতেন। নোয়াজিসের হুসেন কুলি খাঁ নামক একজন কর্ম্মচারী ছিল। তাঁহার সহিত ঘেসিটি বেগমের অবৈধ প্রণয় ছিল। আমিনা বেগম সিরাজের মা, তিনিও হুসেন কুলিখাঁর নিকটে আত্মবিসর্জ্জন করেন; সমস্ত লোকে তাঁহাদের নির্লজ্জ আচরণের জন্য নিন্দা এবং কুৎসা করিত। অবশেষে সিরাজ তাঁহার মাতামহের অনুমতি লইয়া ঢাকায় গিয়া হুসেনকুলি খাঁ এবং তাঁহার নির্দ্দোষী অন্ধ ভ্রাতাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেন।

আলীবর্দ্দি খাঁর মতন কর্ম্মঠ শাসনকর্ত্তা কখন বাঙ্গালা দেশে শাসন করেন নাই। প্রজাদের হিতাকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদাই তাঁহার মনে জাগিত। তিনি যতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, ততদিন বর্গীর হাঙ্গামে তিনি কোনদিন শান্তি পান নাই, যতদিন তিনি পারিয়াছিলেন ততদিন তিনি মাহারাট্টাদের সহিত লড়াই করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্যই নিয়মে বাঁধা ছিল, এই প্রজাবৎসল নবাবের মৃত্যু হইলে সিরাজদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাব হইলেন।

ইহার পরবর্ত্তী ইতিহাস "ব্রিটিশ ভারত"
বইতে প্রকাশিত হইবে।